ফেলুদা সমগ্র

টিনটোরেটোর যীশু

সত্যজিৎ রায়

BENGALIEBOOK.COM 2021

সূচিপত্র

১. রুদ্রশেখরের কথা (১) 2
২. শিবপুরের ট্রাফিক 6
৩. ভবেশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে........ 12
৪. রাত্তিরের ঘটনাটা........ 24
৫. কলকাতায় ফিরে এসে........ 30
৬. প্লেনে নাগপুরে 38
৭. ছবিটা কি লোপাট হয়ে গেল........ 45
৮. রুদ্রশেখরের কথা (২) 52
৯. ইন্সপেক্টর মহাদেব মণ্ডল........ 55
১০. আমাদের হংকং যাওয়া........ 64
১১. পূর্ণেন্দুবাবু বললেন 75
১২. হংকং-এ হিমসিম 90

১. রুদ্রশেখরের কথা (১)

মঙ্গলবার ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সন্ধা সাড়ে ছটায় একটি কলকাতার ট্যাক্সি-নম্বর ডব্লিউ. বি. টি. ৪১২২-বৈকুণ্ঠপুরের প্রাক্তন জমিদার নিয়োগীদের বাড়ির গাড়িবারান্দায় এসে থামল।

দারোয়ান এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটি বছর পঞ্চান্নার ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে এলেন। ভদ্রলোকের রং ফরসা, চুল অবিন্যস্ত, মুখে কাঁচা-পাকা গোঁফদাঁড়ি, চোখে টিনটেড গ্লাসের চশমা, পরনে গাঢ় নীল টেরিলিনের স্যুট।

গাড়ির ড্রাইভার ক্যারিয়ারের ডালা খুলে একটি ব্রাউন রঙের সুটকেস বার করে ভদ্রলোকের পাশে রাখল।

নিয়োগী সাহাব? দারোয়ান প্রশ্ন করল।

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন। দারোয়ান সুটকেসটা তুলে নিল।

আসুন, বাবু আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

বাড়ির বর্তমান মালিক সৌম্যশেখর নিয়োগী দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে বায়ু সেবন করছিলেন। আগন্তুককে দেখে তিনি একটু সোজা হয়ে বসে নমস্কার করে সামনে রাখা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন। সৌম্যশেখরের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। দৃষ্টির দুর্বলতা হেতু চোখে পুরু চশমা পরতে হয়েছে, এ ছাড়া শরীরে বিশেষ কোনও ব্যারাম নেই।

আপনিই রুদ্রশেখর?

আগন্তুক ইতিমধ্যে চেয়ারে বসে কোটের বুক পকেট থেকে একটি পাসপোর্ট বার করে সৌম্যশেখরের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। সৌম্যশেখর সেটি হাতে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে একটু হেসে বললেন, দেখুন কী কাণ্ড। আপনি আমার আপনি খুড়তুতো ভাই, অথচ আপনাকে পাসপোর্ট দেখিয়ে সেটা প্রমাণ করতে হচ্ছে। অবিশ্যি আপনাকে দেখলে নিয়োগী পরিবারের বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না।

ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোণে একটা সামান্য কীতুকের আভাস দেখা গেল।

তা যাকগে, পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে বললেন সৌম্যশেখর, আপনার রোম থেকে লেখা চিঠিটা পেয়ে আমি যে উত্তর দিয়েছিলাম সেটা আপনি পেয়েছিলেন। আশা করি। আপনি যে অ্যাদ্দিন আসেননি সেটাই আমাদের কাছে একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। কাক ঘর ছেড়ে চলে যান ফিফটি ফাইভে, অর্থাৎ সাতাশ বছর আগে! থার্টি-এইটে কাকা যখন আপনাকে ছাড়াই দেশে ফিরলেন তখন অনুমান করেছিলুম। আপনাদের দুজনের মধ্যে খুব একটা বনিবনা নেই। কাকা অবিশ্যি এ নিয়ে কোনওদিন কিছু বলেননি, আর আমরাও জিজ্ঞেস করিনি। শুধু জানতুম যে তাঁর একটি ছেলে আছে রোমে। তা এখন যে এলেন, সেটা বোধ করি সম্পত্তির ব্যাপারে?

হ্যাঁ।

আপনাকে তো লিখেছিলুম যে বছর দশেক আগে অবধি মাঝে মাঝে একটা করে কাকার পোস্টকার্ড পেয়েছি। তারপর আর পাইনি। কাজেই আইনের চোখে তাঁকে মৃত বলেই ধরে নেওয়া যায়। আপনি এ বিষয়ে উকিলের সঙ্গে কথা বলেছেন?

হ্যাঁ

তা বেশ তো। আপনি ক'দিন থাকুন। এখানে। সব দেখে-শুনে নিন। ওপরে কাকার স্টুডিয়ো এখনও সেইভাবেই আছে। রং তুলি ছবি ক্যানভাস সবই আছে, আমরা কেউ হাত দিইনি। কী আছে না আছে সব দেখে নিন। ব্যাঙ্কের বই-টই সবই আছে। তবে, আপনাদের

ইটালিতে কী রকম জানি না, আমাদের দেশে এসব ব্যাপারে লেখাপড়া হতে হতে ছমাস লেগে যায়। আপনি সময় হাতে নিয়ে এসেছেন আশা করি?

হ্যাঁ।

মাঝে মাঝে তো কলকাতায় যাতায়াত করতে হবে; ট্যাক্সিটা রেখে দিয়েছেন তো?

হ্যাঁ।

আপনার ড্রাইভারের থাকার বন্দোবস্ত করে দেবে আমার লোক, কোনও অসুবিধা হবে।

গ্রা–থ্যাঙ্কস

রুদ্রশেখর বলতে গিয়েছিলেন গ্রাৎসিয়ে, অর্থাৎ ইটালিয়ান ভাষায় ধন্যবাদ।

ইয়ে, আপনি আমাদের দিশি খাবারে অভ্যস্ত কি? লন্ডনে তো শুনিচি রাস্তার মোড়ে মোড়ে ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ, রোমেও আছে কি?

কিছু আছে।

বেশ, তা হলে আর চিন্তা নেই। গাঁয়ে দেশে আপনাকে যে হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে দেব তারও তো উপায় নেই। –কী, জগদীশ-কী হল?

একটি বৃদ্ধ ভূত্য দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখে বোঝা যায় সে কোনও রকমে অশ্রু সংবরণ করে আছে।

হুজুর, ঠুমরী মরে গেছে।

মরে গেছে?

হাঁ হুজুর।

সেকী? ভিখু যে ওকে নিয়ে বেড়াতে বেঝোল।

ওরা কেউ ফেরেনি। তাই খুঁজতে গেলাম। বাঁশবনে মরে আছে হুজুর। ভিখু পালিয়েছে।

সংগীতপ্রিয় সৌম্যশেখরের দুটি ফক্স টেরিয়ারের একটির নাম ছিল ষ্টুমরী, একটি কাজরী। কাজরী স্বাভাবিক কারণেই মারা গেছে দু বছর আগে। ঠুম্‌রীর বয়স হয়েছিল এগারো। তবে আজ বিকেল অবধি সে ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ।

সৌম্যশেখরকে প্রিয় কুকুরের শোকে বিহ্বল দেখে সদ্য রোম থেকে আগত রুদ্রশেখর নিয়োগী চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

এই বেলা তাঁর থাকার ঘরটা দেখে নিতে হবে।

২. শিবপুরের ট্রাফিক

শিবপুরের ট্রাফিক আর ঘন বসতি পেরিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে নাম্বার সিকস-এ আমাদের গাড়িটা পড়তেই যেন একটা নতুন জগতে এসে পড়লাম। আমাদের গাড়ি মানে রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ুর সবুজ অ্যাম্বাসাডার। গাড়ি কেনার পয়সা ফেলুদার নিজের কোনও দিন হবে বলে মনে হয় না। এ দেশের প্রাইভেট ইনভেসটিগেটরের রোজগারে গাড়ি বাড়ি হয় না। আমাদের রজনী সেন রোডের ফ্ল্যাট ছেড়ে ফেলুদা কিছুদিন থেকেই একটা নিজের ফ্ল্যাটে যাবার চিন্তা করছিল, বাবা সেটা জানতে পেরে এক ধমকে ফেলুদাকে ঠাণ্ডা করেছেন।সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, বললেন বাবা। যেই একটু রোজগার বেড়েছে আমনি নিজের ফ্ল্যাটের ধান্দা। পরে পসার কমলে যদি আবার সুড়সুড়ি করে এই কাকার ফ্ল্যাটেই ফিরে আসতে হয়? সেটার কথা ভেবেছিস কি? তারপর থেকে ফেলুদা চুপ।

আর গাড়ির ব্যাপারে জটায়ুর তো আগে থেকেই বলা আছে।ধরে নিন আমার গাড়ি ইজ ইকুয়াল টু আপনার গাড়ি। আপনি আমার এত উপকার করেছেন, এই সামান্য প্রিভিলেজটুকু তো আপনার ন্যায্য পাওনা মশাই।

উপকারের ব্যাপারটা লালমোহনবাবুর ভাষাতেই বলা ভাল! ওঁর জীবনের অনেকগুলো বন্ধ দরজা নাকি ফেলুদা এসে খুলে দিয়েছে। তাতে নাকি উনি শরীরে নতুন বল মনে নতুন সাহস আর চোখে নতুন দৃষ্টি পেয়েছেন। আর, কত জায়গায় ঘোরা হল বলুন তো আপনার দৌলতে-দিল্লি, বোম্বাই, কাশী, সিমলা, রাজস্থান, সিকিম, নেপাল-ওঃ! ট্র্যাভেল ব্রডনস দি মাইন্ড–এটা শুনে এসেছি সেই ছেলেবেলা থেকে। এটার সত্যতা উপলব্ধি করলুম তো আপনি আসার পর।

এবারের ট্রাভেলটায় মনের প্রসার কতটা বাড়বে জানি না। ক্যালকাটা টু মেচেদা ভ্রমণ বলতে তেমন কিছুই নয়। তবে লালমোহনবাবুরাই ভাষায় আজকাল কলকাতায় বাস করা

আর ব্ল্যাক হোলে বাস করা নাকি একই জিনিস। সেই ব্ল্যাক হাল থেকে একটি দিনের জন্যও যদি বাইরে বেরিয়ে আসা যায় তা হলে খাঁটি অক্সিজেন পেয়ে মানুষের আয়ু নাকি কমপক্ষে তিন মাস বেড়ে যায়।

অনেকেই হয়তো ভাবছে। এত জায়গা থাকতে মেচেদা কেন। তার কারণ সংখ্যাতাত্ত্বিক ভবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। মাস তিনেক হল এর কথা কাগজে পড়ার পর থেকেই লালমোহনবাবুর রোখি চেপেছে এর সঙ্গে দেখা করার।

এই ভবেশ ভট্টাচার্য নাকি সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে লোকেদের নানা রকম অ্যাডভাইস দিয়ে তাঁদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। বড় বড় ব্যবসাদার, বড় বড় কোম্পানির মালিক, খবরের কাগজের মালিক, ফিল্মের প্রযোজক, বইয়ের প্রকাশক, উপম্যাসের লেখক, উকিল, ব্যারিস্টার, ফিল্মস্টার-সব রকম লোক নাকি এখন তাঁর মেচেদার বাড়ির দরজায় কিউ দিচ্ছে। জটায়ুর শেষ উপন্যাসের কাটতি আগের তুলনায় কম—এক মাসে তিনটে এডিশনের বদলে দুটো এডিশন হয়েছে। জটায়ুর বিশ্বাস উপন্যাসের নামে গণ্ডগোল ছিল, তাই এবার ভটচার্য মশাইয়ের অ্যাডভাইস নিয়ে নতুন বইয়ের নামকরণ হবে, তারপর সেটা বাজারে বেরুবে 1 ফেলুদার মত অবিশ্যি আলাদা! গত উপন্যাসটা পড়েই ফেলুদা বলেছিল রংটা বেশি চড়ে গেছে। —সাত-সাতটা গুলি খাওয়া সত্ত্বেও আপনার হিরোকে বাঁচিয়ে রাখাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না, লালমোহনবাবু?

কী বলছেন মশাই! একি যেমন-তেমন হিরো? প্রখর রুদ্র ইজ এ সুপার-সুপারসুপারম্যান ইত্যাদি। এবারের গল্পটা ফেলুদার মতে বেশ জমেছে, নামের রদবদলে বিক্রির এদিক ওদিক হবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু তাও লালমোহনবাবু একবার সংখ্যাতাত্ত্বিকের মত না নিয়ে ছাড়বেন না। তাই মেচেদা।

ন্যাশনাল হাইওয়ে সিকস। খুব বেশি দিন হল তৈরি হয়নি। এই রাস্তাই সোজা চলে গেছে বম্বে! গ্র্যান্ড ট্যাঙ্ক রোডের ধারে ধারে যেমন সব প্রাচীন গাছ দেখা যায়, এখানে তা একেবারেই নেই। বাড়ি-ঘরও বেশি নেই, চারিদিক খোলা, আশ্বিন মাসের প্রকৃতির

চেহারাটা পুরোপুরি পাওয়া যায়। ড্রাইভার হরিপদবাবু স্পিডোমিটারের কাঁটা আশি কিলোমিটারে রেখে দিয়ে দিব্যি চালাচ্ছেন গাড়ি। কলকাতা থেকে মেচেদ যেতে লাগবে দু ঘণ্টা। আমরা বেরিয়েছি। সকাল সাড়ে সাতটায়; কাজ সেরে দেড়টা-দুটোর মধ্যে স্বচ্ছন্দে ফিরে আসতে পারব।

কোলাঘাট পেরিয়ে মিনিট তিনেক যাবার পরেই একটা উদ্ভট গাড়ির দেখা পেলাম যেটা রাস্তার একপাশে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। মালিক করুণ মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন গাড়ির পাশেই। আমাদের আসতে দেখে ভদ্রলোক হাত নাড়লেন, আর হরিপদবাবু ব্রেক কষলেন। একটা বিশ্রী গোলমালে পড়েছি মশাই, রুমালে ঘাম মুছতে মুছতে বললেন ভদ্রলোক। টায়ারটা গেছে, কিন্তু জ্যাকটা বোধ হয়। অন্য গাড়িতে রয়ে গেছে, হেঁ হেঁ..

আপনি চিন্তা করবেন না, বললেন লালমোহনবাবু।দেখো তো হরিপদ।

হরিপদবাবু জ্যাক বার করে নিজেই ভদ্রলোকের গাড়ির নীচে লাগিয়ে সেটাকে তুলতে আরম্ভ করে দিলেন।

আপনার এ গাড়ি কোন ইয়ারের? প্রশ্ন করল ফেলুদা।

থার্টি-সিক্স, বললেন ভদ্রলোক, আর্মস্ট্রং সিড্‌লি।

লং রানে কোনও অসুবিধা হয় না?

দিব্যি চলে। আমার আরও দুটো পুরনো গাড়ি আছে। ভিনটেজ কারু-র‍্যালিতে প্রতিবারই যোগ দিই। আমি। ইয়ে, আপনারা চললেন কতদূর?

মেচেদায় একটু কাজ ছিল।

কতক্ষণের কাজ?

আধা ঘণ্টাখানেক।

তা হলে একটা কাজ করুন না। ওখান থেকে আমাদের বাড়িতে চলে আসুন। মেচেদা থেকে বাঁয়ে রাস্তা ধরবেন-মাত্র আট কিলোমিটার। বৈকুণ্ঠপুর।

বৈকুণ্ঠপুর?

ওখানেই পৈতৃক বাড়ি আমাদের। আমি অবিশ্যি থাকি কলকাতায়। তবে মা-বাবা ওখানেই থাকেন। দুশো বছরের পুরনো বাড়ি। আপনাদের খুব ভাল লাগবে। দুপুরে আমাদের ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করে বিকেলের দিকে চলে আসবেন। আপনারা আমার যা উপকার করলেন। কতক্ষণ যে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। জানি না।

ফেলুদা একটু যেন অন্যমনস্ক। বলল, বৈকুণ্ঠপুর নামটা কোথায় যেন দেখেছি রিসেন্টলি?

ভূদেব সিং-এর লেখাতে কি? ইলাস্ট্রেটেড উইকলিতে?

হাঁ হ্যাঁ। মাস দেড়েক আগে বেরিয়েছিল।

আমি শুনেছি লেখাটির কথা, কিন্তু পড়া হয়নি।

ইলাস্ট্রেটেড উইকলি আমাদের বাড়িতে আসে না! ফেলুদা কোথায় gছলছ ঐনৈি। হেয়ার কাটিং সেলুনে। একটা বিশেষ সেলুনে ও যায়। আর ইয়াসিন নাপিত ছাড়া কাউকে দিয়ে চুল কাটায় না। ইয়াসিন যতক্ষণ ব্যস্ত থাকে ফেলুদা ততক্ষণ ম্যাগাজিন পড়ে।

বৈকুণ্ঠপুরের নিয়োগী পরিবারের একজনকে নিয়ে লেখা, বলল ফেলুদা, ভদ্রলোক ছবি আঁকতেন। রোমে গিয়ে আঁকা শিখেছিলেন।

আমার দাদু চন্দ্রশেখর, হেসে বললেন ভদ্রলোক। আমি ওই পরিবারেরই ছেলে। আমার নাম নবকুমার নিয়োগী।

আই সি। আমার নাম প্রদোষ মিত্র। ইনি লালমোহন গাঙ্গুলী, আর ইনি আমার খুড়তুতো ভাই তপেশ।

প্রদোষ মিত্র শুনে ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে গেল।

গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হলে তো আপনাদের আসতেই হবে। আপনি তো বিখ্যাত লোক মশাই। সত্যি বলতে কী, এর মধ্যে আপনার কথা মনেও হয়েছিল একবার।

কেন বলুন তো?

একটা খুনের ব্যাপারে। আপনি শুনলে হাসবেন, কারণ ভিকটিম মানুষ নয়, কুকুর।

বলেন কী? কবে হল এ খুন?

গত মঙ্গলবার। আমাদের একটা ফক্স টেরিয়ার। বাবার খুবই প্রিয় কুকুর ছিল।

খুন মানে?

চাকরের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল। আর ফেরেনি। চাকরও ফেরেনি। কুকুরের লাশ পাওয়া যায় বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে, একটা বাঁশবনে। মনে হয় বিষাক্ত কিছু খাওয়ানো হয়েছিল। বিস্কিটের গুঁড়ো পড়ে ছিল আশেপাশে।

এ তো অদ্ভুত ব্যাপার। এর কোনও কিনারা হয়নি?

উহুঁ। কুকুরের বয়স হয়েছিল এগারো। এমনিতেই আর বেশিদিন বাঁচত না। আমার কাছে ব্যাপারটা তাই আরও বেশি মিস্টিরিয়াস বলে মনে হয়। যাই হোক, আপনাকে অবিশ্যি এ

নিয়ে তদন্ত করতে হবে না, কিন্তু আপনারা এলে সত্যিই খুশি হব। দাদুর স্টুডিয়ো এখনও রয়েছে, দেখিয়ে দেব।

ঠিক আছে বলল ফেলুদা। আমারও লেখাটা পড়ে যথেষ্ট কৌতুহল হয়েছিল নিয়াগী পরিবার সম্বন্ধে। আমরা কাজ সেরে সাড়ে দশটা নাগাত গিয়ে পড়ব।

মেচেদার মোড় থেকে দু-কিলোমিটার গেলে একটা পেট্রল পাম্প পড়ে। সেখানে জিজ্ঞেস করলেই বৈকুণ্ঠপুরের রাস্তা বাতলে দেবে।

টায়ার লাগানো হয়ে গিয়েছিল। আমাদের গাড়ি আরও স্পিড়ে যাবে বলে ভদ্রলোক আমাদেরই আগে যেতে দিলেন। গাড়ি রওনা হবার পর ফেলুদা বলল, কত যে ইন্টারেস্টিং বাঙালি চরিত্র আছে যাদের নামও আমরা জানি না। এই চন্দ্রশেখর নিয়োগী বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চব্বিশ বছর বয়সে রোমে চলে যান ওখানকার বিখ্যাত অ্যাকাডেমিতে পেন্টিং শিখতে। ছাত্র থাকতেই একটি ইটালিয়ান মহিলাকে বিয়ে করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দেশে ফিরে আসেন। এখানে পেট্রেট আঁকিয়ে হিসেবে খুব নাম হয়। নেটিভ স্টেটের রাজ-রাজড়াদের ছবি আঁকতেন। একটি রাজার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়। তিনিই লিখেছেন প্রবন্ধটা। প্রৌঢ় বয়সে আঁকাটাকা সব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান।

আপনি বলছেন চন্দ্রশেখরের কথা। আর আমি ভাবছি কুকুর খুন, বললেন লালমোহনবাবু। এ জিনিস শুনেছেন কখনও?

ফেলুদা স্বীকার করল সে শোনেনি।লেগে পড়ুন মশাই বললেন লালমোহনবাবু শাঁসালে মক্কেল। তিন তিনখানা ভিনটেজ গাড়ি। হাতের ঘড়িটা দেখলেন? কমপক্ষে ফাইভ থাউজ্যান্ড চিপস। এ দাঁও ছাড়বেন না।

৩. ভবেশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে

ভবেশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে পোস্টকার্ডে অ্যাপায়েন্টমেন্ট করা ছিল, তাই তাঁর দর্শন পেতে দেরি হল, না! ইস্কুল মাস্টার টাইপের চেহারা, চোখে মোটা চশমা, গায়ে ফতুয়ার উপর একটা এন্ডির চাদর, বসেছেন তক্তপোশে, সামনে ডেস্কের উপর গোটা পাঁচেক ছুচোলো করে কাটা পেনসিল, আর একটা খোলা খেরোর খাতা।

লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়?-পোস্টকার্ডে নামটা পড়ে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক। লালমোহনবাবু মাথা নাড়লেন।বয়স কত হল? লালমোহনবাবু বয়স বললেন।

জন্মতারিখ?

উনত্রিশে শ্রাবণ।

হুঁ...সিংহ রাশি। তা আপনার জিজ্ঞাসাটা কী?

আজ্ঞে আমি রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজে উপন্যাস লিখি। আমার আগামী উপন্যাসের তিনটি নাম ঠিক করা আছে। কোনটা ব্যবহার করব যদি বলে দেন।

কী কী নাম?

‘কারাকোরামে রক্ত কার?’, ‘কারাকোরামের মরণ কামড়’, আর ‘নরকের নাম কারাকোরাম’ ।

হুঁ। দাড়ান।

ভদ্রলোক নামগুলো খাতায় লিখে নিয়ে কী সব যেন হিসেব করলেন, তার মধ্যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সবই আছে। তারপর বললেন, আপনার নাম থেকে সংখ্যা পাচ্ছি একুশ,

আর জন্ম-মাস এবং জন্মতারিখ মিলিয়ে পাচ্ছি। ছয়। তিন সাতে একুশ, তিন দুগুণে ছয়। অর্থাৎ তিনের গুণণীয়ক না হলে ফল ভাল হবে না। আপনি তৃতীয় নামটাই ব্যবহার করুন। তিন আঠারং চুয়ান্ন। কবে বেরোচ্ছে বই?

আজ্ঞে পয়লা জানুয়ারি।

উঁহু। তেসরা করলে ভাল হবে, অথবা তিনের গুণণীয়ক যে-কোনও তারিখ।

আর, ইয়ে–বিক্রিটা–?

বই ধরবে।

একশোটি টাকা খামে পুরে দিয়ে আসতে হল। ভদ্রলোককে। লালমোহনবাবুর তাতে বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। উনি ষোল আনা শিওর যে বই হিট হবেই। বললেন, মনের ভার নেমে গিয়ে অনেকটা হালকা লাগছে মশাই।

তার মানে এবার থেকে কি প্রত্যেক বই বেরোবার আগেই মেচেদা–?

বছরে দুটি তো! সাক্সেসের গ্যারান্টি যেখানে পাচ্ছি...

ভট্টাচার্য মশাইয়ের কাছে বিদায় নিয়ে একটা চায়ের দোকানে চা খেয়ে আমরা বৈকুণ্ঠপুর রওনা দিলাম। নবকুমারবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী পেট্রল পাম্পে জিজ্ঞেস করে নিয়োগী প্যালেসে পৌঁছাতে লাগল বিশ মিনিট।

বাড়ির বয়স যে দুশো সেটা আর বলে দিতে হয় না। খানিকটা অংশ মেরামত করে রং করা হয়েছে সম্প্রতি, বাড়ির লোকজন বোধহয় সেই অংশটাতেই থাকে। দুদিকে পাম গাছের সারিওয়ালা রাস্তা পেরিয়ে বিরাট পোর্টিকের নীচে এসে আমাদের গাড়ি থামল। নবকুমারবাবু গাড়ির আওয়াজ পেয়েই নীচে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। একগাল হেসে আসুন

আসুন বলে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। আমরা কথা রাখব কি না। এ বিষয়ে তাঁর খানিকটা সংশয় ছিল এটাও বললেন।

বাবাকে আপনার কথা বলেছি, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে বললেন ভদ্রলোক। আপনারা আসছেন শুনে উনি খুব খুশি হলেন।

আর কে থাকেন এ বাড়িতে গল্প জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

সব সময় থাকার মধ্যে বাবা আর মা! মা-র জন্যেই থাকা। ওঁর শ্বাসের কষ্ট। কলকাতার ক্লাইমেট সহ্য হয় না। তা ছাড়া বঙ্কিমবাবু আছেন। বাবার সেক্রেটারি ছিলেন। এখন ম্যানেজার বলতে পারেন। আর চাকর-বাকার; আমি মাঝে মধ্যে আসি; এমনিতেওঁ আমি ফ্যামিলি নিয়ে আর ক'দিন পরেই আসতাম। এ বাড়িতে পুজো হয়, তাই প্রতিবারই আসি। এবারে একটু আগে এলাম। কারণ শুনলাম বাড়িতে অতিথি আছে-আমার কাকা, চন্দ্রশেখরের ছেলে, রোম থেকে এসেছেন। ক'দিন হল–তই মনে হল বাবা হয়তো একা ম্যানেজ করতে পারছেন না।

আপনার কাকার সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ আছে বুঝি?

একেবারেই না। এই প্রথম এলেন। বোধহয় দাদুর সম্পত্তির ব্যাপারে।

আপনার দাদু কি মারা গেছেন?

খবরাখবর নেই বহুদিন। বোধহয় মৃত বলেই ধরে নিতে হবে।

উনি রোম থেকে ফিরে এসে এখানেই থাকতেন?

হ্যাঁ।

কলকাতায় না থেকে এখানে কেন?

কারণ উনি যাদের ছবি আঁকতেন তারা সারা ভারতবর্ষে ছড়ানো। নেটিভ স্টেটের রাজা মহারাজা। কাজেই ওঁর পক্ষে কলকাতায় থাকার কোনও বিশেষ সুবিধে ছিল না।

আপনি আপনার দাদুকে দেখেছেন?

উনি যখন বাড়ি ছেড়ে চলে যান। তখন আমার বয়স ছয়। আমায় ভালবাসতেন। খুব এইটুকু মনে আছে।

বৈঠকখানায় আসবাবের চেহারা দেখে চোখ টেরিয়ে গেল। মাথার উপরে ঘরের দুদিকে দুটো ঝাড়লণ্ঠন রয়েছে যেমন আর আমি কখনও দেখিনি। একদিকের দেয়ালে প্রায় আসল মানুষের মতো বড় একটা পোর্ট্রেট রয়েছে। একজন বৃদ্ধেরু-গায়ে জোব্বা, কোমরে তলোয়ার, মাথায় মণিমুক্ত বসানো পাগড়ি। নবকুমার বললেন। ওটা ওঁর প্রপিতামহ অনন্তনাথ নিয়োগীর ছবি। চন্দ্রশেখর ইন্টালি থেকে ফিরে এসেই ছবিটা এঁকেছিলেন। – ছেলে ইটালিয়ান মেয়ে বিয়ে করেছে শুনে অনন্তনাথ বেজায় বিরক্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন। আর কোনওদিন ছেলের মুখ দেখবেন না। কিন্তু শেষ বয়সে ওঁর মনটা অনেক নরম হয়ে যায়। দাদু বিপত্নীক অবস্থায় ফিরলে উনি দাদুকে ক্ষমা করেন, এবং উনিই দাদুর প্রথম সিটার।

আমি একটা কথা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

এস, নিয়োগী লেখা দেখছি কেন? ওঁর নাম তো ছিল চন্দ্রশেখর।

রোমে গিয়ে ওঁর নাম হয়। সানড্রো। সেই থেকে ওই নামই লিখতেন নিজের ছবিতে।

পোর্ট্রেট ছাড়া ঘরে আরও ছবি ছিল এস, নিয়োগীয় আঁকা। আর্টের বইয়ে যে সব বিখ্যাত বিলিতি পেস্টারের ছবি দেখা যায়, তার সঙ্গে প্রায় কোনও তফাত নেই। বোঝাই যায় দুর্দান্ত শিল্পী ছিলেন সানড্রো নিয়োগী।

একজন চাকর শরবত নিয়ে এল। ষ্ট্রে থেকে একটা গেলাস তুলে নিয়ে ফেলুদা প্রশ্ন করল।

ওই প্রবন্ধটাতে ভদ্রলোক লিখেছেন চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিগত সংগ্রহে নাকি কোনও বিখ্যাত বিদেশি শিল্পীর আঁকা একটি পেন্টিং ছিল। অবিশ্যি ভদ্রলোক শিল্পীর নাম বলেননি, কারণ চন্দ্রশেখরই নাকি ওঁকে বলতে বারণ করেছিলেন–বলেছিলেন বললে কেউ বিশ্বাস করবে: না। আপনি কিছু জানেন এই পেন্টিং সম্বন্ধে?

নবকুমারবাবু বললেন, দেখুন, মিস্টার মিত্র-পেন্টিং একটা আছে। এটা আমাদের পরিবারের সকলেই জানে। বেশি বড় না। এক হাত বাই দেড় হাত হবে। একটা ক্রাইস্টের ছবি। সেটা কোনও বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা কি না বলতে পারব না। ছবিটা দাদু নিজের স্টুডিয়োর দেয়ালেই টাঙিয়ে রাখতেন, অন্য কোনও ঘরে টাঙানো দেখিনি কখনও।

অবিশ্যি যিনি প্রবন্ধটা লিখেছেন তিনি জানেন নিশ্চয়ই।

তা তো জানবেনই, কারণ ভগওয়ানগড়ের এই রাজার সঙ্গে দাদুর খুবই বন্ধুত্ব ছিল।

আপনার কাকা জানতেন না? যিনি এসেছেন?

নবকুমার মাথা নাড়লেন।

আমার বিশ্বাস বাপ আর ছেলের মধ্যে বিশেষ সম্ভাব ছিল না। তা ছাড়া কাকা বোধহয় আর্টের দিকে যাননি।

তার মানে ওই ছবির সঠিক মূল্যায়ণ এ বাড়িএ কেউ করতে পারবে না?

কাকা না পারলে আর কে পারবে বলুন। বাবা হলেন গানবাজনার লোক! বাতদিন ওই নিয়েই পড়ে থাকতেন। আর্টের ব্যাপারে আমার যা জ্ঞান, ওঁরাও সেই জ্ঞান; আর আমার ছোটভাই নন্দকুমার সম্বন্ধেও ওই একই কথা।

তিনিও গানবাজনা নিয়ে থাকেন বুঝি?

না। ওর হল অ্যাকটিং-এর নেশা। আমাদের একটা ট্র্যাভেল এজেন্সি আছে কলকাতায়। বাবাই করেছিলেন, আমরা দুজনেই পার্টনার ছিলাম তাতে। নন্দ সেভেন্টি-ফাইভে হঠাৎ সব ছেড়ে ছুড়ে বম্বে চলে যায়। ওর এক চেনা লোক ছিল ওখানকার ফিল্ম লাইনে। তাকে ধরে হিন্দি ছবিতে একটা অভিনয়ের সুযোগ করে নেয়। তারপর থেকে ওখানেই আছে।

সাকসেসফুল?

মনে তো হয় না। ফিল্ম পত্রিকায় গোড়ার দিকের পরে তো আর বিশেষ ছবিটবি দেখিনি ওর।

আপনার সঙ্গে যোগাযোগ আছে?

মোটেই না। শুধু জানি নেপিয়ান সি রোডে একটা ফ্ল্যাটে থাকে। বাড়ির নাম বোধহয় সি-ভিউ; মাঝে মাঝে ওর নামে চিঠি আসে। সেগুলো রিডাইরেক্ট করতে হয়। ব্যাস।

সরবত শেষ করে আমরা নবকুমারবাবুর বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

দক্ষিণের একটা চওড়া ঝরান্দায় একটা ইংরেজি পেপারব্যাক চোখের খুব কাছে নিয়ে আরাম কেদারায় বসে আছেন ভদ্রলোক।

আমাদের সঙ্গে পরিচয়ের পর ভদ্রলোক ছেলেকে বললেন, টুমরীর কথা বলেছিস এঁকে?

নবকুমারবাবু একটু অপ্রস্তুত ভাব করে বললেন, তা বলেছি। তবে ইনি এমনি বেড়াতে এসেছেন, বাবা।

ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে গেল।

কুকুর বলে তোরা ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছিস না, এটা আমার মোটে ভাল লাগছে। না। একটা অবোলা জীবকে যে-লোকে এভাবে হত্যা করে তার কি শাস্তি হওয়া উচিত নয়? শুধু কুকুরকে মেরেছে তা নয়, আমার চাকরকে শাসিয়েছে। তাকে মোটা ঘুষ

দিয়েছে। নইলে সে পালাত না। ব্যাপারটা অনেক গণ্ডগোল। আমার তো মনে হয় যে-কোনও ডিটেকটিভের পক্ষে এটা একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। মিস্টার মিত্তির কী মনে করেন জানি না।

আমি আপনার সঙ্গে একমত, বলল ফেলুদা!

যাক! আমি শুনে খুশি হলুম। এবং সে লোককে যদি ধরতে পারেন তো আরও খুশি হব। ভাল কথা–সৌম্যশেখরবাবু ছেলের দিকে ফিরলেন—তোর সঙ্গে রবীনবাবুর দেখা হয়েছে?

রবীনবাবু? নবকুমারবাবু বেশ অবাক। তিনি আবার কে?

একটি জানালিস্ট ভদ্রলোক। বয়স বেশি না। আমায় লিখেছিল আসবে বলে। চন্দ্রশেখরের জীবনী লিখবে। একটা ফেলোশিপ না গ্রন্ট কী জানি পেয়েছে। সে দু দিন হল এসে রয়েছে। অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে। ইটালিও যাবে বলে বলছে। বেশ চৌকস ছেলে; আমার সঙ্গে কথা বলে সকলে ঘণ্টাখানেক ধরে। টেপ করে নেয়।

তিনি কোথায় এখন?

বোধহয় তার ঘরেই আছে। এক তলায় উত্তরের বেডরুমটীয় রয়েছে। আরও দিন দশোক থাকবে। রাতদিন কাজ করে।

সামলানোর আর কী আছে; রোম থেকে আসা খুড়তুতো ভাইটিকে তো সারাদিন প্রায় চাখেই দেখি না। আর যখন দেখিও, দুচারটের বেশি কথা হয় না। এমন মুখচোরা লোক দুটি দেখিনি।

যখন কথা বলেন কী ভাষায় বলেন? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

ইংরিজি বাংলা মেশানো। বললে চন্দ্রশেখর নাকি ওর সঙ্গে বাংলাই বলত। তবে সেও তো আজ প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেছে। চন্দ্রশেখর যখন দেশে ফেরে তখন ছেলের বয়স

আঠারো-উনিশ। বাপের সঙ্গে বোধহয় বিশেষ বনত না। পাছে কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করি তাই বোধহয় কথা বলাটা অ্যাভয়োড় করে। ভেবে দেখুন-আমার নিজের খুড়তুতো ভাই, তাকে পাসপোর্ট দেখিয়ে বোঝাতে হল। সে কে!

ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট কি? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

তই তো দেখলাম।

নবকুমার বললে, তুমি ভাল করে দেখেছিলে তো?

ভাল করে দেখার দরকার হয় না। সে যে নিয়োগী পরিবারের ছেলে সে আর বলে দিতে হয় না।

উনি সম্পত্তির ব্যাপারেই এসেছেন তো? জিজ্ঞেস কবল ফেলুদা।

হ্যাঁ; এবং পেয়েও যাবে। সে নিজে তার বাবার কোনও খবরই জানত না। তাই রোম থেকে চিঠি লিখেছিল আমায়। আমিই তাকে জানাই যে দশ বছর হল তার বাপের কোনও খোঁজ নেই। তার পরেই সে এসে উপস্থিত হয়।

ফেলুদা বলল, চন্দ্রশেখরের সংগ্রহে যে বিখ্যাত পেন্টিংটা আছে সেটা সম্বন্ধে উনি কিছু জানেন? কিছু বলেছেন?

না। ইনি নাকি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর লোক। আর্টে কোনও ইন্টারেস্ট নেই!..তবে ছবিটার খোঁজ করতে লোক এসেছিল।

কে? জিজ্ঞেস করলেন নবকুমারবাবু।

সোমানি না। কী যেন নাম। বঙ্কিমের কাছে তার নাম ঠিকানা আছে। বললে এক সাহেব কালেক্টর নাকি ইন্টারেস্টেড। এক লাখ টাকা অফার করলে। প্রথমে পঁচিশ হাজার দেবে, তারপর সাহেব দেখে জেনুইন বললে বাকি টাকা; দিন পনেরো আগের ঘটনা। তখনও

রুদ্রশেখর আসেনি, তবে আসবে বলে লিখেছে। সোমানিকে বললাম এ হল আর্টিস্টের ছেলের প্রপার্টি। সে ছেলে আসছে। যদি বিক্রি করে তো সেই করবে! আমার কোনও অধিকার নেই।

সে লোক কি আর এসেছিল? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

এসেছিল বই কী। সে নাছোড়বান্দা। এবার রুদ্রশেখরের সঙ্গে কথা বলেছে।

কী কথা হয়েছিল জানেন?

না। আর রুদ্র যদি বিক্রিও করতে চায়, আমাদের তো কিছু বলার নেই। তার নিজের ছবি সে যা ইচ্ছে করতে পারে।

কিন্তু সেটা সম্পত্তি পাবার আগে তো নয়, বলল ফেলুদা।

না, তা তো নয়ই।

খাবার সময় দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গেই দেখা হল। রবীনবাবু সাংবাদিককে দেখে হঠাৎ কেন জানি চেনা-চেনা মনে হয়েছিল। হয়তো কোনও কাগজে ছবি-টবি বেরিয়েছে। কখনও। দাড়ি-গোঁফ কামানো, মাঝারি রং, চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল। বয়স ত্রিশ-পয়ত্রিশের বেশি না। বললেন অদ্ভুত সব তথ্য ধার করেছেন চন্দ্রশেখর নিয়োগী সম্বন্ধে। স্টুডিয়োতে একটা কাঠের বাক্সে নাকি অনেক মূল্যবান কাগজপত্র আছে।

রুদ্রশেখরবাবু থাকতে আপনার খুব সুবিধে হয়েছে বোধহয়? বলল ফেলুদা, ইটালির অনেক খবর তো আপনি এঁর কাছেই পাবেন।

ওঁকে আমি এখনও বিরক্ত করিনি, বললেন রবীনবাবু, উনি নিজে ব্যস্ত রয়েছেন। আপাতত আমি চন্দ্রশেখরের ভারতবর্ষে ফিরে আসার পরের অংশটা নিয়ে রিসার্চ করছি।

রুদ্রশেখরের মুখ দিয়ে একটা হুঁ ছাড়া আর কোনও শব্দ বেরোল না।

বিকেলে নবকুমারবাবুর সঙ্গে একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, কাছেই পোড়া ইটের কাজ করা দুটো প্রাচীর মন্দির আছে সেগুলো নাকি খুবই সুন্দর। ফটক দিয়ে বেরিয়ে গ্রামের রাস্তায় পড়তেই একটা কাণ্ড হল। পশ্চিম দিক থেকে ঘন কালো মেঘ এসে আকাশ ছেয়ে ফেলল, আর দশ মিনিটের মধ্যেই বজ্রপাতের সঙ্গে নামল তুমুল বৃষ্টি। লালমোহনবাবু বললেন এরকম ড্রামাটিক বৃষ্টি তিনি কখনও দেখেননি। সেটার একটা কারণ অবশ্য এই যে এ রকম খোলা প্রান্তরে বৃষ্টি দেখার সুযোগ শহরবাসীদের হয় না।

দৌড় দেওয়া সত্ত্বেও বৃষ্টির ফোঁটা এড়ানো গেল না। তারপর বুঝতে পারলাম যে এ বৃষ্টি সহজে ধরার নয়। আর আমাদের পক্ষে এই দুর্যোগের সন্ধ্যায় কলকাতায় ফেরাও সম্ভব নয়।

নবকুমারবাবু অবিশ্যি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। বললেন বাড়তি শোবার ঘর কম করে দশখানা আছে। এ বাড়িতে। খাট বালিশ তোশক চাদর মশারি সবই আছে; কাজেই রাত্তিরে থাকার ব্যবস্থা করতে কোনওই হাঙ্গামা নেই। পরার জন্য লুঙ্গি দিয়ে দেবেন। উনি, এমনকী গায়ের আলোয়ান, ধোপে কাচা পাঞ্জাবি, সবই আছে। -আমাকে এখানে মাঝে মাঝে আসতে হয় বলে কয়েক সেট কাপড় রাখাই থাকে। আপনারা কোনও চিন্তা করবেন না।

উত্তরের দিকে পাশাপাশি দুটো পোল্লায় ঘরে আমাদের বন্দাবস্ত হল। লালমোহনবাবু একা একটি জাঁদরেল খাট পেয়েছেন, বললেন, এক'দিন-কা সুলতানের গপ্পের কথা মনে পড়ছে মশাই।

তা খুব ভুল বলেননি। দুপুরে শ্বেত পাথরের থালাবাটি গোলাসে খাবার সময় আমারও সে কথা মনে হয়েছিল। স্নাত্তিরে দেখি সেই সব জিনিসই রুপোর হয়ে গেছে।

আপনার দাদুর স্টুডিয়োটা কিন্তু দেখা হল না, খেতে খেতে বলল ফেলুদা।

সেটা কাল সকালে দেখাব, বললেন নবকুমারব্বাবু।আপনারা যে দুটো ঘরে শুচ্ছেন, ওটা ঠিক তারই উপরে।

যখন শোবার বন্দোবস্ত করছি, তখন বৃষ্টিটা ধরে গেল। জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলাম ধ্রুবতারা দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। রাজবাড়ির পিছনে বাগান, সামনে মাঠ। আমাদের ঘর থেকে বাগানটাই দেখা যাচ্ছে, তার গাছে গাছে জোনাকি জ্বলছে। অন্য কোনও বাড়ির শব্দ এখানে পৌঁছায় না, যদিও পুবে বাজারের দিক থেকে ট্রানজিস্টারের গানের একটা ক্ষীণ শব্দ পাচ্ছি।

সাড়ে দশটা নগাত লালমোহনবাবু গুডনাইট করে তাঁর নিজের ঘরে চলে গেলেন। দুই ঘরের মাঝখানে একটা দরজা আছে। ভদ্রলোক বললেন সেটা বেশ কনভিনিয়েন্ট।

এই দরজা দিয়েই ভদ্রলোক মাঝরাত্তিরে ঢুকে এসে চাপা গলায় ডাক দিয়ে ফেলুদার ঘুম ভাঙলেন। সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্যি আমারও ঘুম ভেঙে গেল।

কী ব্যাপার মশাই? এত রাত্তিরে?

শ্ শ্ শ্ শ্! কান পেতে শুনুন।

কোন পাতলাম। আর শুনলাম।

খচ্ খচ্ খচ্ খচু...

মাথার উপর থেকে শব্দটা আসছে। একবার একটা খুঁট শব্দও পেলাম! কেউ হাঁটাচলা করছে।

মিনিট তিনেক পরে শব্দ থেমে গেল।

উপরেই সানড্রো নিয়োগীর স্টুডিয়ো।

ফেলুদা ফিসফিস করে বলল, তোরা থাক, আমি একটু ঘুরে আসছি।

ফেলুদা খালি পায়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

লালমোহনবাবু আর আমি আমাদের খাটে বসে রইলাম। প্রচণ্ড সাসপেন্স, ফেলুদা না-আসা পর্যন্ত হৃৎপিণ্ডটা ঠিক আলজিভের পিছনে আটকে রইল। প্রাসাদের কোথায় যেন ঘড়িতে ঢং ঢেং করে দুটো বাজল। তারপর আরও দুটো ঘড়িতে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আবার ঠিক তেমনি নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢুকল ফেলুদা।

দেখলেন কাউকে? চাপা গলায় ঘড়ঘড়ে গলায় লালমোহনবাবুর প্রশ্ন।

ইয়েস।

কাকে?

।সিঁড়ি দিয়ে এক তলায় নেমে গেল।

কে?

সাংবাদিক রবীন চৌধুরী।

৪. রাত্তিরের ঘটনাটা

রাত্তিরের ঘটনাটা আর নবকুমারবাবুকে বলল না ফেলুদা। চায়ের টেবিলে শুধু জিজ্ঞেস করল, স্টুডিয়োটা চাবি দেওয়া থাকে না?

এমনিতে সবসময়ই থাকে, বললেন নবকুমারবাবু, তবে ইদানীং রবীনবাবু প্রায়ই গিয়ে কাজ করেন। রুদ্রশেখরবাবুও যান, তাই ওটা খোলাই থাকে। চাবি থাকে বাবার কাছে।

চা খাওয়ার পর আমরা চন্দ্রশেখরের স্টুডিয়োটা দেখতে গেলাম।

তিনতলায় ছাত। তারই একপাশে উত্তর দিকটায় স্টুডিয়ো। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকে ঘুরে স্টুডিয়োতে ঢোকার দরজা।

পুরোটাই কাচ। বেশ বড় ঘরের চারদিকে ছড়ানো রয়েছে ভাই করা ছবি, নানান সাইজের কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো সাদা ক্যানভাস, দুটো বেশ বড় টেবিলের উপর রং তুলি প্যালেট ইত্যাদি নানারকম ছবি আকার সরঞ্জাম, জানালার পাশে দাঁড় করানো একটা ইজেল। সব দেখেটেখে মনে হয় আর্টিস্ট যেন কিছুক্ষণের জন্য স্টুডিয়া ছেড়ে বেরিয়েছেন, আবার এক্ষুনি ফিরে এসে কাজ শুরু করবেন।

জিনিসপত্তর সবই বিলিতি, চারিদিক দেখে ফেলুদা মন্তব্য করল।এমনকী লিনসীড অয়েলের শিশিটা পর্যন্ত। রংগুলো তো দেখে মনে হয় এখনও ব্যবহার করা চলে।

ফেলুদা দু-একটা টিউব তুলে টিপে টিপে পরীক্ষা করে দেখল।

হুঁ, ভাল কন্ডিশনে রয়েছে জিনিসগুলো। রুদ্রশেখর এগুলো বিক্রি করেও ভাল টাকা পেতে পারেন। আজকালকার যে কোনও আর্টিস্ট এসব জিনিস পেলে লুফে নেবে।

ঘরের দক্ষিণ দিকের বড় দেয়ালে আট-দশটা ছবি টাঙানো রয়েছে। তার একটার দিকে নবকুমারবাবু আঙুল দেখালেন।

ওটা দাদুর নিজের আঁকা নিজের ছবি।

জানি। চন্দ্রশেখর নিজেকে এঁকেছেন বিলিতি পোশাকে। চমৎকার শার্প, সুপুরুষ চেহারা। কাঁধ অবধি ঢেউখেলানো কুচকুচে কালো চুল, দাড়ি আর গোঁফও খুব হিসেব করে আঁচড়ানো বলে মনে হয়।

এই ছবিটাই ওই প্রবন্ধের সঙ্গে বেরিয়েছে বলল ফেলুদা।

তা হবে, বললেন নবকুমারবাবু, বাবার কাছে শুনেছিলাম ভূদেব সিং-এর এক ছেলে এখানে এসেছিল এক'দিনের জন্য। বাপের আর্টিকলের জন্য বেশ কিছু ছবি তুলে নিয়ে যায়।

ভদ্রলোকের রং তো তেমন ফরসা ছিল বলে মনে হচ্ছে না।

না, বললেন নবকুমারবাবু। উনি আমার প্রপিতামহ অনন্তনাথের রং পেয়েছিলেন। মাঝারি।

সেই বিখ্যাত ছবিটা কোথায়? এবার ফেলুদা প্রশ্ন করল।

এদিকে আসুন, দেখাচ্ছি।

নবকুমারবাবু আমাদের নিয়ে গেলেন দক্ষিণের দেয়ালের একেবারে কোণের দিকে।

গিল্টিকরা ফ্রেমে বাঁধানো রয়েছে যীশুখ্রিস্টের ছবিটা।

মাথায় কাঁটার মুকুট, চোখে উদাস চাহনি, ডান হাতটা বুকের উপর আলতো করে রাখা। মাথার পিছনে একটা জ্যোতি, তারও পিছনে গাছপালা-পাহাড়-নদী-বিদ্যুৎ-ভরা মেঘ মিলিয়ে একটা নাটকীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য।

আমরা মিনিটখানেক ধরে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম ছবিটার দিকে। কিছুই জানি না, অথচ মনে হল হাজার ঐশ্বর্য হাজার রহস্য লুকিয়ে রয়েছে ওই ছবির মধ্যে।

ফেলুদার হাবভাবে বেশ বুঝতে পারছিলাম যে বৈকুণ্ঠপুরের নিয়োগীদের সঙ্গে সম্পর্ক এইখানেই শেষ নয়। নীচে এসেই ফেলুদা একটা অনুরোধ করল নবকুমারবাবুকে।

আপনাদের একটা বংশলতিকা পাওয়া যাবে কি? অনন্তনাথ থেকে শুরু করে আপনারা পর্যন্ত জন্ম মৃত্যু ইত্যাদির তারিখ সমেত হলে ভাল হয়, আর আলাদা করে চন্দ্রশেখরের জীবনের জরুরী তারিখগুলো। অবিশ্যি যেসব তারিখ আপনাদের জানা আছে।

আমি বঙ্কিমবাবুকে বলছি। উনি খুব এফিশিয়েন্ট লোক। দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি করে। দেবেন। আপনাকে।

আর, ইয়ে-যে ভদ্রলোক ছবি কিনতে এসেছিলেন তাঁর ঠিকানাটা। যদি বঙ্কিমবাবুর কাছে থাকে।

বঙ্কিমবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বেশ চালাক চেহারা। হাসলেই গোঁফের নীচে ধবধবে সাদা দাঁতের পাটি বেরিয়ে পড়ে। বললেন, বংশলতিকা একটা রবীনবাবুর জন্য করেছিলেন, তার কার্বন রয়েছে। সেটা পেতে দশ মিনিটের জায়গায় লাগল দু মিনিট।

যিনি ছবি কিনতে এসেছিলেন তাঁর একটা কার্ড বঙ্কিমবাবুর কাছে ছিল, উনি সেটা এনে দিলেন ফেলুদাকে। দেখলাম নাম হচ্ছে হীরালাল সোমানি, ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ২৩, লেটাস টাওয়ারস, আমীর আলি অ্যাভিনিউ।

কার্ডটা দেবার পর ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, মুখে একটা কিন্তু কিন্তু ভাব। ফেলুদা বলল, কিছু বলবেন কি?

আপনার নাম শুনেছি, বললেন ভদ্রলোক, আপনি ডিটেকটিভ তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনি কি আবার আসবেন?

প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই আসব। কেন বলুন তো?

ঠিক আছে, ভদ্রলোকের এখনও সেই ইতস্তত ভাব। –মানে, একটু ইয়ে ছিল। তা সে পরেই হবে।

আমার কাছে ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময় মনে হল, যদিও পরে ফেলুদাকে বলতে ও বলল, বোধহয় অটোগ্রাফ নেবার ইচ্ছে ছিল, বলতে সাহস পেলেন না।

গাড়িতে যখন উঠছি তখন ফেলুদা নবকুমারবাবুকে বলল, অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার নিয়োগী! আপনাদের এখানে এসে সত্যিই ভাল লাগল। যা দেখলাম আর শুনলাম, তা খুবই ইন্টারেস্টিং। আমি যদি একটু এদিক ওদিক খোঁজখবর করি তাতে আপনার আপত্তি হবে না তো?

মোটেই না।

একবার ভগাওয়ানগড়ে ভূদেব সিং-এর কাছে যাবার ইচ্ছে আছে। ওই খীশুর বাজার দরটা কী হতে পারে সেটা একবার ওঁর কাছ থেকে জানা দরকার।

বেশ তো, চলে যান ভগওয়ানগড়। আমার আপত্তির কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

আর আপনার বাবা কিন্তু ঠিকই বলেছেন; আপনাদের ফক্স-টেরিয়ার খুনের ব্যাপারটাকে কিন্তু আপনি মোটেই হালকা করে দেখবেন না; আমি ওটার মধ্যে গূঢ় রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।

তা তো বটেই। আমার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত নৃশংস বলে মনে হয়েছিল।

ফেলুদা আর নবকুমারবাবুর মধ্যে কার্ড বিনিময় হল। ভদ্রলোক বললেন, আপনি প্রয়োজনে টেলিফোন করবেন, তেমন বুঝলে সোজা চলে আসবেন। আর ভগওয়ানগড়ে কী হল সেটা দয়া করে জানিয়ে দেবেন।

*

ভগওয়ানগড় বলে যে একটা জায়গা আছে সেটাই জানা ছিল না, মশাই, ফেরার পথে বললেন লালমোহনবাবু।

জায়গাটা বোধহয় মধ্যপ্রদেশে, বলল ফেলুদা। তবে আই অ্যাম নট শিওর। গিয়েই পুষ্পক ট্র্যাভেলসের সুদর্শন চক্রবর্তীর শরণাপন্ন হতে হবে।

এম পি-টা দেখা হয়নি, আপন মনে বললেন জটায়ু।

অবিশ্যি এ যাত্রায় যে বিশেষ দেখা হবে সেটা মনে করবেন না। স্রেফ কতগুলো তথ্য জেনে নিয়ে ফিরে আসা। বৈকুণ্ঠপুরুকে বেশিদিন নেগলেকটি করা চলবে না।

এটা কেন বলছেন?

রুদ্রশেখরের পায়ের দিকে লক্ষ করেছেন?

কই, না তো? রবীন চৌধুরীর খাওয়াটা লক্ষ করেছেন?

কই, না তো।

তা ছাড়া ভদ্রলোক রাত দুটোর সময় স্টুডিয়োতে কী করেন, বঙ্কিমবাবু কী বলতে গিয়ে বললেন না, একটা কুকুরকে কী কী কারণে খুন করা যেতে পারে-এসব অনেক প্রশ্ন আছে।

আমি বললাম, কোনও বাড়ির কুকুর যদি ভাল ওয়াচডগ হয়, তা হলে একজন চোর সে-বাড়ি থেকে কিছু সরাবার মতলব করে থাকলে আগে কুকুরকে সরাতে পারে।

ভেরি গুড। কিন্তু কুকুরকে মারা হয়েছে মঙ্গলবার আঠাশে সেপ্টেম্বর, আর আজ হল ৫ই অক্টোবর। কই, এখনও তো কিছু চুরি হয়েছে বলে জানা যায়নি। আর, এগারো বছরের বুড়ো ফক্স-টেরিয়ার কতই বা ভাল ওয়াচডগ হবে?

আমার কী আপশোঁস হচ্ছে জানেন তো? বললেন লালমোহনবাবু।

কী?

যে আর্টের বিষয় এত কম জানি।

বর্তমান ক্ষেত্রে শুধু এইটুকু জানলেই চলবে যে একজন প্রাচীন যুগের প্রখ্যাত শিল্পীর ছবি যদি বাজারে আসে, তা হলে তার দাম লাখ দু লাখ টাকা হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

অ্যাঁ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তার মানে বলতে চান একটি লাখ টাকার ছবি আজি চল্লিশ বছর ধরে টাঙানো রয়েছে বৈকুণ্ঠপুরের ওই স্টুডিয়োর দেয়ালে, অথচ সেটা সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না?

ঠিক তাই। এবং সেইটো জানার জন্যেই ভগাওয়ানগড়ে যাওয়া।

৫. কলকাতায় ফিরে এসে

কলকাতায় ফিরে এসেই ফেলুদা প্রবন্ধের কথাটা উল্লেখ করে একটা জরুরি অ্যাপিয়েন্টমেন্ট চেয়ে টেলিগ্রাম করে দিল ভগওয়ানগড়ের এক্স মহারাজা ভূদেব সিংকে। তার আগেই অবিশ্যি পুষ্পক ট্র্যাভেলসে ফোন করেছিল ফেলুদা! ও ঠিকই আন্দাজ করেছিল; ভগওয়ানগড় মধ্যপ্রদেশেই, তবে আমাদের প্রথমে যেতে হবে নাগপুরে। সেখান থেকে ছাট লাইনের ট্রেনে ছিন্দওয়ারা। ছিন্দওয়ারা থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পশ্চিমে হল ভগওয়ানগড়।

টেলিগ্রামের উত্তর এসে গেল পরের দিনই। এই সপ্তাহে যে-কোনওদিন গেলেই ভূদেব সিং আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। কবে যাচ্ছি জানিয়ে দিলে ছিন্দওয়ারাতে রাজার লোক গাড়ি নিয়ে থাকবে।

সুদর্শনবাবুকে ফোন করতে ভদ্রলোক বললেন, আপনাদের তাড়া থাকলে কাল বুধবার ভোরে একটা নাগপুর ফ্লাইট আছে। সাড়ে ছাঁটায় রওনা হয়ে পৌঁছবেন সোয়া আটটায়। তারপর নাগপুর থেকে সাড়ে দশটায় ট্রেন আছে, সেটা ছিন্দওয়ারা পৌঁছবে বিকেল পাঁচটায়। ট্রেনের টিকিট আপনাদের ওখানেই কেটে নিতে হবে।

আর ফেরার ব্যাপারটা? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

আপনি বিষুদ্দবার রাত্রে আবার ছিন্দওয়ারা থেকে ট্রেন ধরতে পারবেন। সেটা নাগপুর পৌঁছবে শুক্রবার ভোর পাঁচটায়। সেদিনই কলকাতার ফ্রাইট আছে তিন ঘণ্টা পরে। সাড়ে দশটায় ব্যাক্ ইন ক্যালকাটা।

সেইভাবেই যাওয়া ঠিক হল, আর রাজাকেও জানিয়ে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হল।

আজকের বাকি দিনটা হাতে আছে, তাই ফেলুদা ঠিক করল এই ফাঁকে একটা জরুরি কাজ সেরে নেবে।

টেলিফোনে অ্যাপিয়েন্টমেন্ট করে আমরা বিকেল সাড়ে পাঁচটায় গিয়ে হাজির হলাম। আমীর আলি অ্যাভিনিউতে লোটাস টাওয়ারসে হীরালাল সোমানির ফ্ল্যাটে।

বেল টিপতে একটি বেয়ারা এসে দরজা খুলে আমাদের বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল।

ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায়। ভদ্রলোকের সংগ্রহের বাতিক আছে, আর অনেক জিনিসেরই যে অনেক দাম সেটাও বুঝতে অসুবিধে হয় না। যেটা নেই সেটা হল সাজানার পারিপাট্য।

ঝাড়া দশ মিনিট বসিয়ে রাখার পর সোমানি সাহেব প্রবেশ করলেন, আর করা মাত্র একটা পারফিউমের গন্ধ ঘরটায় ছড়িয়ে পড়ল। বুঝলাম তিনি সবেমাত্র গোসল সেরে এলেন। সাদা ট্রাউজারের উপর সাদা কুতর্গা। পায়ে সাদা কোলাপুরি চটি। পালিশ করে আঁচড়ানো চুলেও সাদার ছাপ লক্ষ করা যায়। যদিও সরু করে ছাঁটা গোঁফটা সম্পূর্ণ কালো।

ভদ্রলোক আমাদের সামনের সোফায় বসে ফেলুদা ও লালমোহনবাবুকে সিগারেট অফার করে নিজে একটা ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন–

বলুন কী ব্যাপার।

আমি কয়েকটা ইনফরমেশন চাইছিলাম, বলল ফেলুদা।

আপনি রিসেন্টলি একটা ছবির খোঁজে বৈকুণ্ঠপুর গিয়েছিলেন। তাই না?

ইয়েস

ওরা বিক্রি করতে রাজি হননি।

নো।

আপনি ছবির কথাটা কীভাবে জানলেন সেটা জানতে পারি কি?

ভদ্রলোক প্রশ্নটা শুনে একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলেন, যেন ফেলুদা বাড়াবাড়ি করছে, এবং উত্তর দেওয়া-না দেওয়াটা তাঁর মার্জি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উত্তরটা এল।

আমি জানিনি। আরেকজন জেনেছিলেন। আমি তাঁরই রিকোয়েস্টে ছবি কিনতে গিয়েছিলাম।

আই সি।

আপনি কি সেই ছবি আমায় এনে দিতে পারেন? তবে, জেনুইন জিনিস চাই। ফোজারি হলে এক পইসা ভি নহী মিলেগ।

জাল না। আসল সেটা আপনি বুঝবেন কী করে?

আমি বুঝব কেন? যিনি কিনবেন তিনি বুঝবেন। হি হ্যাঁজ থাটিফাইভ ইয়ারস এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ এ বাইয়ার অফ পেন্টিংস।

তিনি কি এদেশের লোক?

সোমানি সাহেবের চোয়ালটা যেন একটু শক্ত হল। ভদ্রলোক ধোঁয়া ছেড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্য সরেনি। ফেলুদার দিক থেকে। এই প্রথম ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোণে একটা হাসির আভাস দেখা গেল।

এ ইনফরমেশন আমি আপনাকে দেব কেন? আমি কি বুদ্ধু?

ঠিক আছে।

ফেলুদা ওঠার জন্য তৈরি হচ্ছিল, এমন সময় সোমানি বললেন, আপনি যদি আমাকে এনে দিতে পারেন, আমি আপনাকে কমিশন দেবী।

শুনে সুখী হলাম।

টেন থাউজ্যান্ড ক্যাশ।

আর তারপর সেটা দশ লিখে বিক্রি করবেন?

সোমানি কোনও উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টি চেয়ে রইল ফেলুদার দিকে।

ছবি পেলে আপনাকে দেব কেন, মিস্টার সোমানি? বলল ফেলুদা। আমি সোজা চলে যাব আসল লোকের কাছে।

নিশ্চয় যাবেন, বাট ওনলি ইফ ইউ নো হায়্যার টু গো।

সে সব বার করার রাস্তা আছে, মিস্টার সোমানি। সকলের না থাকলেও, আমার আছে।..আমি আসি।

ফেলুদা উঠে পড়ল।

অনেক ধন্যবাদ।

গুডডে, মিস্টার প্রদোষ মিত্র।

শেষ কথাটা ভদ্রলোক এমনভাবে বললেন যেন উনি ফেলুদার নাম ও পেশা দুটোর সঙ্গেই বিশেষভাবে পরিচিত।

একরকম মাংসাশী ফুল আছে না, বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, লালমোহনবাবু, দেখতে খুব বাহারে, অথচ পোকা পেলেই কপি করে গিলে ফেলে?

আছে বই কী।

এ লোক যেন ঠিক সেইরকম।

ফেলুদার উৎকণ্ঠার ভাবটা বুঝতে পারলাম যখন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে এসেই ও বৈকুণ্ঠপুরে একটা ফোন করল।

তবে নবকুমার বললেন আর নতুন কোনও ঘটনা ঘটেনি।

বাড়িতে ফিরে বৈঠকখানায় বসে ভাই, শ্রীনাথকে একটু চা করতে বলে না, বলে লালমোহনবাবু পকেট থেকে একটা বই বার করে সশব্দে টেবিলের উপর রাখলেন। বইটা হল সমগ্র পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস, লেখক অনুপম ঘোষদস্তিদার।

কী বলছেন ঘোষদস্তিদার মশাই? আড়চোখে বইটা দেখে প্রশ্ন করল ফেলুদা। ও নিজে আজই দুপুরে সিধু জ্যাঠার বাড়িতে গিয়ে দুটো মোটা আর্টের বই নিয়ে এসেছে সেটা আমি জানি।

ওঃ, ভেরি ইউজফুল মশাই। আপনি আর রাজা কথা বলবেন আর্ট নিয়ে, আর আমি হংসমধ্যে বক যথা, এ হতে দেওয়া যায় না। এটা পড়ে নিলে আমিও পার্টিসিপেট করতে পারব।

গোটা বইটা পড়ার কোনও দরকার নেই; আপনি শুধু রেনেসাঁস অংশটা পড়ে রাখবেন। রেনেসাঁস আছে তো ও বইয়ে?

তা তো বলছে না।

তবে কী বলছে?

রিনেইস্যান্স।

ঘোষদস্তিদারের জবাব নেই।

জিনিসটা তো একই?

তা একই।

ইয়ে, রেনেসাঁস বলতে বোঝাচ্ছেটা কী?

পঞ্চদশ আর ষোড়শ শতাব্দী। এই দেড়শো-দুশো বছর হল ইটালির পুনর্জন্মের যুগ। রেনেসাঁস হল পুনর্জন্ম, পুনর্জাগরণ।

কেন পুনঃ বলছে কেন? হোয়াই এগেইন?

কারণ প্রাচীন গ্রিক ও রোম্যান সভ্যতার আদর্শে ফিরে যাওয়ার একটা ব্যাপার ছিল এই যুগে-যে আদর্শ মধ্যযুগে হারিয়ে গিয়েছিল। তাই রেনেসাঁস। ইটালিতে শুরু হলেও রেনেসাঁসের প্রভাব ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত ইউরোপে। বহু প্রতিভা জন্মেছে এই সময়টাতে। শিল্পে, সাহিত্যে, সংগীতে, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে। ছাপাখানার উদ্ভব এই সময়; তার মানে শিক্ষার প্রসার এই সময়। কোপনিকাস, গ্যালিলিও, শেক্সপিয়র, দাভিঞ্চি, রাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো—সব এই দেড়শো-দুশো বছরের মধ্যে।

তা আপনার কি ধারণা বৈকুণ্ঠপুরের খীশুও আঁকা হয়েছে এই রেনেসাঁসের যুগে?

তার কাছাকাছি তো বটেই। আগে নয় নিশ্চয়ই, বরং সামান্য পরে হতে পারে। মধ্যযুগের পেন্টিং-এ মানুষ জন্তু গাছপালা সব কিছুর মধ্যে একটা কেঠো-কেঠো, আড়ষ্ট, অস্বাভাবিক ভাব দেখতে পাবেন। রেনেসাঁসে সেটা আরও অনেক জীবন্ত, স্বাভাবিক হয়ে ঊ6। ?

এই যে সব নাম দেখছি এ বইয়ে-গায়োট্টো–

গায়োট্টো লিখেছে নাকি?

তই তো দেখছি। গায়োট্টো, বটিসেল্লি, মানটেগনা...

আপনি ও বইটা রাখুন। আমি আর্টিস্টের নামের একটা তালিকা করে দেব-আপনি চান তো সে নামগুলো মুখস্থ করে রাখবেন। গায়োট্টো নয়। ইংরিজি উচ্চারণে জিয়োটা, ইটালিয়ানে জ্যোত্তো। জ্যোত্তো, বত্তিচেল্লী, মানতেন্যা...

এরা সব বলছেন জাঁদরেল আকিয়ে ছিলেন?

নিশ্চয়ই! শুধু এঁরা কেন? এ রকম অন্তত ত্রিশটা নাম পাবেন শুধু ইটালিতেই।

আর এই ত্রিশ জনের মধ্যে একজনের আঁকা ছবি রয়েছে বৈকুণ্ঠপুরে? বোঝো!

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলুদা নিয়োগীদের বংশলতিকা খাটে বিছিয়ে সেটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। সেই সঙ্গে অবিশ্যি চন্দ্রশেখরের জীবন সংক্রান্ত তারিখগুলোও ছিল। সে কার দাদু, কে কার কাকা, কে কার ভাই, এগুলো আমার একটু গুলিয়ে যাচ্ছিল। এবার সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

দুটো জিনিসের চেহারা এই রকম–

বংশলতিকা

১। অনন্তনাথ (১৮৬২-১৯৪১)

সূর্যশেখর (১৮৮৮-১৯৪৮)
সৌম্যশেখর (১৯১৩-)
নবকুমার (১৯৪১-)
চন্দ্রশেখর (১৮৯০-?)
রুদ্রশেখর (১৯২০-)
নন্দকুমার (১৯৪৪) ?

২। চন্দ্রশেখর নিয়োগী

১৮৯০ –জন্ম (বৈকুণ্ঠপুর)
১৯১২ –প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাশ
১৯১৪ –রোমযাত্রা। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের ছাত্র
১৯১৭ – কার্লা ক্যাসিনিকে বিবাহ
১৯২০ – পুত্র রুদ্রশেখরের জন্ম
১৯৩৭ –কার্লার মৃত্যু
১৯৩৮ –স্বদেশে প্রত্যাবর্তন
১৯৫৫ –গৃহত্যাগ

৬. প্লেনে নাগপুরে

প্লেনে নাগপুরে সাড়ে আটটার সময় পৌঁছে, সেখান থেকে দশটা পঞ্চাশের প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরে ছিন্দওয়ারা পৌঁছতে প্রায় ছটা বেজে গেল। স্টেশনে শেভরোলে গাড়ি নিয়ে হাজির ছিলেন ভূদেব সিং-এর লোক। হাসিখুশি হৃষ্টপুষ্ট মাঝবয়সী এই ভদ্রলোকটির নাম মি. নাগপাল; চারজন গাড়িতে রওনা দিয়ে পৌনে সাতটার মধ্যে পৌঁছে গোলাম ভগওয়ানগড়ের রাজবাড়ি।

নাগপাল বললেন, আপনাদের জন্য ঘর ঠিক করা আছে, আপনারী হাত-মুখ ধুয়ে নিন, সাড়ে সাতটার সময় রাজা আপনাদের মিট করবেন। আমি এসে আপনাদের নিয়ে যাব।

ঘরের চেহারা দেখেই বুঝলাম যে আজ রাতটা আমাদের এইখানেই থাকার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে। বিছানা, বালিশ, লেপ, মশারি, বাথরুমে তোয়ালে সাবান—সবই রয়েছে। যে কোনও ফাইভ-স্টার হোটেলের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। লালমোহনবাবু বললেন, এখানকার বাথরুমে নাকি তাঁর গড়পারের বাড়ির পাঁচটা বেডরুম ঢুকে যায়। নেহাত টাইম নেই, নইলে টবে গরম জল ভরে শুয়ে থাকতুম আধা ঘণ্টা।

কাঁটায় কটায় সাড়ে সাতটার সময় মিঃ নাগপাল আমাদের রাজার সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। শ্বেতপাথরের মেঝোওয়ালা বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছেন ভুদেব সিং। চেহারা যাকে বলে সৌম্যকান্তি। বয়স সাতত্তর, কিন্তু মোটেও থুত্থুড়ে নন।

আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে রাজার সামনে তিনটে বেতের চেয়ারে বসলাম। হাসনাহানা ফুলের গন্ধে বুঝতে পারছি বারান্দার পরেই বাগান, কিন্তু অন্ধকারে গাছপালা বোঝা যাচ্ছে না।

কথাবার্তা ইংরেজিতেই হল, তবে আমি বেশির ভাগটা বাংলা করেই লিখছি। জটায়ুত বলেছিলেন, পার্টিসিপেট করবেন। কতদূর করেছিলেন সেটা যাতে ভাল বোঝা যায়। তাই নাটকের মতো করে লিখছি।

ভূদেব–আমার লেখাটা কেমন লাগল?

ফেলুদা–খুবই ইন্টারেস্টিং। ওটা না পড়লে এরকম একজন শিল্পীর বিষয় কিছুই জানতে পারতাম না।

ভূদেব–আসলে আমরা নিজের দেশের লোকদের কদর করতে জানি না। বিদেশ হলে এ রকম কখনওই হত না। তাই ভাবলাম—আমার তো বয়স হয়েছে, সেভেনটি-সেভেন–মরে যাবার আগে এই একটা কাজ করে যাব। চন্দ্রশেখরের বিষয় জানিয়ে দেব দেশের লোককে। আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দিলাম। বৈকুণ্ঠপুর। চন্দ্রর সেলফপোর্ট্রেট আমার কাছে ছিল না। সে আমাকে ছবি তুলে এনে দিল।

ফেলুদা–আপনার সঙ্গে চন্দ্রশেখরের আলাপ হয় কবে?

ভূদেব—দাঁড়ান, এই খাতাটায় সব লেখা আছে।..হ্যাঁ, ৫ই নভেম্বর ১৯৪২ সে আমার পোর্ট্রেট আঁকতে আসে এখানে। তার কথা আমি শুনি ভূপালের রাজার কাছ থেকে। রাজার পোর্ট্রেট চন্দ্র করেছিল। আমি দেখেছিলাম। আমার খুব ভাল লেগেছিল। চন্দ্র হ্যাঁড ওয়ান্ডারফুল স্কিল।

জটায়ু–ওয়ান্ডারফুল।

ফেলুদা–আপনার লেখায় পড়েছি তিনি ইটালিতে গিয়ে একজন ইটালিয়ান মহিলাকে বিয়ে করেন। এই মহিলা সম্বন্ধে আরেকটু কিছু যদি বলেন।

জটায়ু–সামথিং মোর...

ভূদেব–চন্দ্রশেখর রোমে গিয়ে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে ভর্তি হয়। ওর ক্লাসেই ছিল কাল ক্যাসিনি। ভেনিসের অভিজাত বংশের মেয়ে। বাবা ছিলেন কাউন্ট। কাউন্ট আলবেতো ক্যাসিনি। কাল ও চন্দ্রশেখরের মধ্যে ভালবাসা হয়। কালা তার বাবার সঙ্গে চন্দ্রশেখরের পরিচয় করিয়ে দেয়। এখানে বলে রাখি, চন্দ্রশেখর আয়ুর্বেদ চর্চা করেছিল। ইটালি যাবার সময় সঙ্গে বেশ কিছু শিকড় বাকল নিয়ে গিয়েছিল। কালার বাপ ছিলেন গাউটের রুগি। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভুগতেন। চন্দ্রশেখর তাঁকে ওষুধ দিয়ে ভাল করে দেয়। বুঝতেই পারছি, এর ফলে চন্দ্রর পক্ষে কাউন্টের মেয়ের পাণিগ্রহণের পথ। অনেক সহজ হয়ে যায়। ১৯১৭-তে বিয়েটা হয়, এবং এই বিয়েতে কাউন্ট একটি মহামূল্য উপহার দেন চন্দ্রকে।

ফেলুদা–এটা কি সেই ছবি?

জটায়ু–রেনেসাঁস?

ভূদেব–হ্যাঁ। কিন্তু এই ছবিটা সম্বন্ধে কতটা জানেন আপনারা?

ফেলুদা–ছবিটা দেখেছি, এই পর্যন্ত। মনে হয় রেনেসাঁস যুগের কোনও শিল্পীর আঁকা।

ভূদেব–আপনারা ঠিকই ধরেছেন, তবে যে-কোনও শিল্পী নয়।

জটায়ু–(বিড়বিড় করে)–বত্তিজাত্তো…দাভিঞ্চেল্লি…

ভূদেব–আপনারা ঠিকই ধরেছেন, তবে যে কোনও শিল্পি নয়। রেনেসাঁসের শেষ পর্বের অন্যতম। সবচেয়ে খ্যাতিমান শিল্পী। টিনটোরেটো!

জটায়ু–ওফ্‌ফ্‌ফ্‌ফ্‌ফ্!

ফেলুদা–টিনটারেটার নিজের আঁকা তো খুব বেশি ছবি আছে বলে জনা যায় না, তাই না?

ভূদেব–না। অনেক ছবিই আংশিক ভাবে টিনটারেটোর আঁকা, বাকিটা এঁকেছে তার স্টুডিয়ো বা ওয়র্কশপের শিল্পীরা। এটা তখনকার অনেক পেন্টার সম্পর্কেই খাটে। তবে কাজটা যে উঁচুদরের তাতে সন্দেহ নেই। সে ছবি চন্দ্র এনে আমাকে দেখিয়েছিল। টিনটোরেটের সব লক্ষণই রয়েছে ছবিটায়। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ক্যাসিনি। প্যালেসে ছিল ছবিটা।

ফেলুদা–তার মানে ওটা তো একটা মহামূল্য সম্পত্তি।

ভূদেব–ওর দাম বিশ-পঁচিশ লাখ হলে আশ্চর্য হব না।

জটায়ু-(নিশ্বাস টেনে)–হিঁ ই ই ই ই!

ভূদেব–সেই জন্যেই তো আমি পেন্টারের নামটা বলিনি প্রবন্ধটায়।

ফেলুদা-কিন্তু তাও বৈকুণ্ঠপুরে লোক এসে খবর নিয়ে গেছে।

ভূদেব–কে? ক্রিকোরিয়ান এসেছিল নাকি?

ফেলুদা–ক্রিকোরিয়ান? কই না তো! ও নামে তো কেউ আসেনি।

ভূদেব–আর্মেনিয়ান ভদ্রলোক। আমার কাছে এসেছিল। ওয়ালটার ক্রিকোরিয়ান। টাকার কুমির। হংকং-এর ব্যবসাদার এবং ছবির কালেক্টর। বলে ওর কাছে ওরিজিনাল রেমব্রান্ট আছে, টানার আছে, ফ্রাগোনার আছে। আমাদের বাড়িতে একটা বুশের-এর ছবি আছে, আমার ঠাকুরদাদার কেনা। সেটা কিনতে এসেছিল। আমি দিইনি। তারপর বলল ও আমার লেখাটা পড়েছে। জিজ্ঞেস করছিল নিয়োগীদের ছবিটার কথা। ও নিজে এত বড়াই করছিল যে আমি উলটে একটু বড়াই করার লোভ সামলাতে পারলাম না। বলে দিলাম টিনটোরেটের কথা। ও তো লাফিয়ে উঠেছে চেয়ার থেকে। আমি বললাম, ও ছবিও তুমি কিনতে পাবে না, কারণ পয়সার লোভের চেয়ে প্রাইড অফ পোজেশন আমাদের ভারতীয়দের অনেক বেশি। এটা তোমরা বুঝবে না। ও বললে, সে ছবি আমার হাতে

আসবেই, তুমি দেখে নিয়ো। বলেছিল নিজেই যাবে বৈকুণ্ঠপুরে। হয়তো হঠাৎ কোনও কাজে ফিরে গেছে। তবে ওর এক দালাল আছে–

ফেলুদা–হীরালাল সোমানি?

ভূদেব–হ্যাঁ।

ফেলুদা–ইনিই গিয়েছিলেন বৈকুণ্ঠপুরে।

ভূদেব-অত্যন্ত ঘুঘু লোক। ওকে যেন একটু সাবধানে হ্যান্ডল করে।

ফেলুদা–কিন্তু ও ছবি তো চন্দ্রশেখরের ছেলের সম্পত্তি। সে তো এখন বৈকুণ্ঠপুরে।

ভূদেব–হোয়াট! চন্দ্রর ছেলে এসেছে? এতদিন পরে?

ফেলুদা–তাকে দেখে এলাম আমরা।

ভূদেব–ও। তা হলে অবিশ্যি সে ছবিটা ক্লেম করতে পারে। কিন্তু টিনটোরেটো তার হাতে চলে যাচ্ছে এটা ভাবতে ভাল লাগে না মিস্টার মিট্রা!

ফেলুদা–এটা কেন বলছেন?

ভূদেব–চন্দ্রর ছেলের কথা তো আমি জানি। চন্দ্রকে কত দুঃখ দিয়েছে তাও জানি। এসব কথা তো নিয়োগীরা জানবে। না, কারণ চন্দ্র আমাকে ছাড়া আর কাউকে বলেনি। পরের দিকে অবিশ্যি ছেলের কথা আর বলতেই না, কিন্তু গোড়ায় বলেছে। ছেলে মুসোলিনির ভক্ত হয়ে পড়েছিল। মুসোলিনি তখন ইটালির একচ্ছত্র অধিপতি। বেশির ভাগ ইটালিয়ানই তাকে পুজো করে। কিন্তু কিছু বুদ্ধিজীবী-শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সংগীতকার–~ ছিলেন মুসোলিনি ও ফ্যাসিস্ট পার্টির ঘোর বিরোধী। চন্দ্র ছিল এদের একজন। কিন্তু তার ছেলেই শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। তার এক বছর আগে কালর্স মারা গেছে। ক্যানসারে। এই দুই ট্রাজিডির ধাক্কা চন্দ্র সইতে পারেনি। তাই সে

দেশে ফিরে আসে। ছেলের সঙ্গে সে কোনও যোগাযোগ রাখেনি। ভাল কথা, ছেলেকে দেখলে কেমন? তার তো ষাটের কাছাকাছি বয়স হবার কথা।

ফেলুদা–বাষট্টি। তবে এমনিতে শক্ত আছেন বেশ। কথাবার্তা বলেন না বললেই চলে।

ভূদেব–বলার মুখ নেই বলেই বলে না।..স্ত্রীর মৃত্যু ও ছেলের বিপথে যাওয়ার দুঃখ চন্দ্র কোনওদিন ভুলতে পারেনি। শেষে তাই তাকে সংসার ত্যাগ করতে হয়েছিল। এই নিয়ে অবশ্য তার সঙ্গে আমার কথা কটাকাটিও হয়। তাকে বলি–তোমার মধ্যে এত ট্যালেন্ট আছে, এখনও কাজের ক্ষমতা আছে, তুমি বিবাগী হবে কেন? কিন্তু সে আমার কথা শোনেনি।

ফেলুদা–আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন কি?

ভূদেব–মাঝে মাঝে একটা করে পোস্টকার্ড লিখত, তবে

অনেক’দিন আর খবর পাইনি। ফেলুদা-শেষ কবে পেয়েছিলেন মনে আছে?

ভূদেব-দাঁড়াও, এই বাক্সের মধ্যেই আছে তার চিঠিগুলো। হ্যাঁ, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭। হৃষীকেশ থেকে লিখেছে এটা।

ফেলুদা–অর্থাৎ পাঁচ বছর আগে। তার মানে তো আইনের চোখে তিনি এখনও জীবিত!

ভূদেব–সত্যিই তো! এটা তো আমার খেয়াল হয়নি।

ফেলুদা–তার মানে রুদ্রশেখর এখনও তার সম্পত্তি ক্লেম করতে পারেন না।

পরদিন ভূদেব সিং গাড়িতে ঘুরিয়ে ভগওয়ানগড়ের যা কিছু দ্রষ্টব্য সব দেখিয়ে দিলেন। আমাদের। গড়ের ভগ্নস্তূপ, ভবানীর মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ গার্ডেনস, পিথেরি লেক, জঙ্গলে হরিণের পাল–কিছুই বাদ গেল না।

কথাই ছিল এবার শেভরোলে গাড়ি আমাদের একেবারে নাগপুর অবধি পৌঁছে দেবে, যাতে আমাদের আর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ঝক্কি পোয়াতে না হয়। গাড়িতে ওঠার আগে ভূদেব সিং ফেলুদার কাঁধে হাত রেখে বললেন––

সি দ্যাট দ্য টিনটোরেটা ডা িজনট ফল ইনটু দ্য রং হ্যান্ডস।

মি. নাগপালকে আগেই বলা ছিল; তিনি ওই আর্মেনিয়ান ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা একটা কাগজে লিখে ফেলুদাকে দিলেন, ফেলুদা সেটা সযত্নে ব্যাগে পুরে রাখল।

পরদিন এগারোটায় বাড়ি ফিরে এক ঘণ্টার মধ্যে বৈকুণ্ঠপুর থেকে নবকুমারবাবুর টেলিফোন এল।

চট করে চলে আসুন মশাই। এখানে গণ্ডগোল ।

৭. ছবিটা কি লোপাট হয়ে গেল

আমরা আধা ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম।

ছবিটা কি লোপাট হয়ে গেল নাকি মশাই? যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

সেইটেই তো ভয় পাচ্ছি।

অ্যাদ্দিন ছবির ব্যাপারটায় ঠিক ইন্টারেস্ট পাচ্ছিলুম না, জানেন। এখন বইটা পড়ে, আর ভূদেব রাজার সঙ্গে কথা বলে কেমন যেন একটা নাড়ীর যোগ অনুভব করছি। ওই টিরিনটোরোর সঙ্গে।

ফেলুদা গম্ভীর, লালমোহনবাবুর ভুল শুধরোনোর চেষ্টাও করল না।

এবারে হরিপদবাবু স্পিডোমিটারের কাঁটা আরও চড়িয়ে রাখায় আমরা ঠিক দুঘণ্টায় পৌঁছে গেলাম।

নিয়োগীবাড়িতে এই তিনদিনে যেমন কিছু নতুন লোক এসেছে-নবকুমারবাবুর স্ত্রী ও দুই ছেলে-মেয়ে-তেমনি কিছু লোক চলেও গেছে।

চন্দ্রশেখরের ছেলে রুদ্রশেখর আজ ভোরে চলে গেছেন কলকাতা।

আর বঙ্কিমবাবুও নেই।

বঙ্কিমবাবু খুন হয়েছেন।

কোনও ভারী জিনিস দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করা হয়, আর তার ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বেশ বেলা পর্যন্ত তাঁর কোনও হদিস না পেয়ে খোঁজাখুঁজি পড়ে যায়। শেষে চাকর গোবিন্দ স্টুডিয়োতে গিয়ে দেখে তাঁর মৃতদেহ পড়ে আছে মেঝেতে, মাথার চার পাশে রক্ত।

পুলিশের ডাক্তার দেখে বলেছে মৃত্যু হয়েছে আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে। সময়-আন্দাজ রাত তিনটে থেকে ভোর পাঁচটার মধ্যে।

নবকুমার বললেন, আপনাকে ফোনে পাওয়া গেল না, তাই বাধ্য হয়েই পুলিশে খবর দিতে হল।

তা ভালই করেছেন, বলল ফেলুদা-কিন্তু কথা হচ্ছে-ছবিটা আছে কি?

সেটাই তো আশ্চর্য ব্যাপার মশাই। আততায়ী যে কে সেটা আন্দাজ করা তো খুব মুশকিল নয়; ভদ্রলোকের হাবভাব এমনিতেই সন্দেহজনক মনে হত। বোঝাই যাচ্ছিল টাকার দরকার, অথচ আইনের পথে যেতে গেলে সম্পত্তি পেতে অন্তত ছ-সাত মাস তো লাগতই–

আরও অনেক বেশি, বলল ফেলুদা, পাঁচ বছর আগেও ভূদেব সিং চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছেন।

তাই বুঝি? তা হলে তো ভদ্রলোকের কোনও লিগ্যাল রাইটই ছিল না।

তাতে অবিশ্যি চুরি করতে কোনও বাধা নেই।

কিন্তু চুরি হয়নি। ছবি যেখানে ছিল সেখানেই আছে।

তাজ্জব ব্যাপার, বলল ফেলুদা।এ জাতীয় ঘটনা সমস্ত হিসেবা-টিসেব গুলিয়ে দেয়। পুলিশে কী বলে?

এক দফা জেরা হয়ে গেছে। সকালেই। আসল কাজ তো হল, যে চলে গেছে তাকে খুঁজে পাওয়া; কারণ, কাল রাত্রে এ বাড়িতে ছিলাম। আমি, আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে, বাবা, মা, রবীনবাবু আর চাকর-বাকর।

রবীনবাবু, ভদ্রলোকটি– ?

উনি প্রায় রোজ রাত দেড়টা-দুটো অবধি ওঁর ঘবে কাজ করেন। চাকরেরা ওঁর ঘরে বাতি জ্বলতে দেখেছে। তাই সকল আটটার আগে বড় একটা ঘুম থেকে ওঠেন না। আটটায় ওঁর ঘরে চা দেয় গোবিন্দ। আজও দিয়েছে। রুদ্রশেখরও যে খুব সকলে উঠতেন তা নয়, তবে আজ সাড়ে ছাঁটার মধ্যে উনি চলে গেছেন। উনি আর ওঁর সঙ্গে একজন আর্টিস্ট।

আর্টিস্ট?

আপনি যেদিন গেলেন সেদিনই এসেছেন কলকাতা থেকে। রুদ্রশেখরই গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। স্টুডিয়োর জিনিসপত্রের একটা ভালুয়েশন করার জন্য। সব বিক্রি করে দেবেন বলে ভাবছিলেন বোধহয়।

ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করে যাননি?

উঁহু। আমি তো জানি কলকাতায় যাচ্ছেন উকিল-টুকিলের সঙ্গে কথা বলতে; কাজ হলেই আবার ফিরে আসবেন। কিন্তু এখন তো আর মনে হয় না ফিরবেন বলে।

আমরা এক তলার বৈঠকখানায় বসে কথা বলছিলাম। নবকুমারবাবু বোধহয় আমাদের দোতলায় নিয়ে যাবেন বলে সোফা ছেড়ে উঠতেই ফেলুদা বলল–

রুদ্রশেখর যে ঘরটায় থাকতেন সেটা একবার দেখতে পারি কি?

নিশ্চয়ই। এই তো পাশেই।

ঘরের দক্ষিণ দিকের দরজা একটা দিয়ে আমরা মেঝেতে চিনে মাটির টুকরো বসানো একটা শোবার ঘরে ঢুকলাম। ঢুকেই মনে হল যেন উনবিংশ শতাব্দীতে এসে পড়েছি। এমন খাট, খাটের উপর মশারি টাঙানোর এমন ব্যবস্থা, এমন ড্রেসিং টেবিল, এমন রাইটিং ডেস্ক, কাপড় রাখার এমন অলিনা-কেনিওটাই আর আজকের দিনে দেখা যায় না। নবকুমারবাবু বললেন, এ ঘরটাতে আগে চন্দ্রশেখরের ভাই সূর্যশেখর।–অর্থাৎ

নবকুমারবাবুর ঠাকুরদা—থাকতেন! ঠাকুরদাদা শেষের দিকে আর দোতলায় উঠতে পারতেন না। অথচ রোজ সকালে-বিকেলে মন্দিরে যাওয়া চাই, তাই একতলাতেই বসবাস করতেন।

বিছানা করা হয়নি দেখছি, বলল ফেলুদা। সত্যি, মশারিটা পর্যন্ত এখনও ঝুলে রয়েছে।

সকাল থেকেই বাড়িতে যা হট্টগোল, চাকরব্যাকররা সব কাজকর্ম ভুলে গেছে আর কী

পাশের ঘরটায় কে থাকে?

ওটায় থাকতেন। বঙ্কিমবাবু।

দুটো ঘরের মাঝখানে একটা দরজা রয়েছে, কিন্তু সেটা বন্ধ। ফেলুদা রুদ্রশেখরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের দরজা দিয়ে ঢুকাল বঙ্কিমবাবুর ঘরে।

এঘরে স্বভাবতই জিনিসপত্র অনেক বেশি। আলনায় জামা-কাপড়, তার নীচে চট-জুতো, টেবিলের উপর কিছু বই, কলপি, প্যাড়, একটা রেমিংটন টাইপরাইটার। দেয়ালে টাঙানো কিছু ফোটাগ্রাফ, তার মধ্যে একটা একজন সন্ন্যাসী-গোছের ভদ্রলোকের; এ ঘরেও বিছানা করা হয়নি। মশারি ঝুলে রয়েছে।

ফেলুদা হঠাৎ খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে মশারিটা তুলে ধরল, তার দৃষ্টি বালিশের দিকে।

বালিশটা তুলতেই তার তলা থেকে একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ল।

একটা ছোট্ট নীল বাক্সের মধ্যে একটা ট্র্যাভেলিং অ্যালাম ক্লিক।

এ জিনিস তো আমরাও এককালে করতুম মশাই বললেন লালমোহনবাবু। আমার পাশের ঘরে ছোটকাকা শুতেন; পরীক্ষার সময় অ্যালার্ম দিয়ে ভোরে উঠাতুম, আর ওঁর যাতে ঘুম না ভাঙে তাই ঘড়িটা রাখতুম, বালিশের নীচে।

হুঁ, বলল ফেলুদা, কিন্তু ইনি অ্যালার্ম দিয়েছিলেন সাড়ে তিনটেয়।

সাড়ে তিনটে!।

নবকুমারবাবু অবাক।

এবং সেই সময়ই বোধহয় গিয়েছিলেন চন্দ্রশেখরের স্টুডিয়োতে। মনে হয় ভয়ানক কিছু একটা সন্দেহ করছিলেন। সেই সন্দেহের কথাটাই বোধহয় আমায় বলতে চেয়েছিলেন গতবার।

*

এই খুনের আবহাওয়াতেও লালমোহনবাবুরু হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে ওঠার কারণ আর কিছুই না; নবকুমারবাবুর এগারো বছরের ছেলে আর ন বছরের মেয়ে দুজনেই বেরিয়ে গেল জটায়ুর অন্ধ ভক্ত। ভদ্রলোককে বৈঠকখানার সোফায় ফেলে দুজনেই চেপে ধরল-একটা। গল্প বলুন! একটা গল্প বলুন!

লালমোহনবাবু খুব স্পিড়ে উপন্যাস লেখেন ঠিকই, তাই বলে কেউ চেপে ধরলেই যে টুথপেস্টের টিউবের মতো গলগল করে নতুন গল্প বেরিয়ে যাবে এমন নয়।আচ্ছা বলছি বলে পর পর তিনবার খানিকদূর এগোতেই ভাই বোনে চেঁচিয়ে ওঠে—আরে, এ তোসাহারায় শিহরন আরে, এ তো হন ডুরাসে হাহাকার এ তো অমুক, এ তো তমুক...

শেষে ভদ্রলোকের কী অবস্থা হল জানি না, কারণ ফেলুদা নবকুমারবাবুকে বলল যে একবার খুনের জায়গাটা দেখবে।

লালমোহনবাবুকে দোতলায় রেখে আমরা তিনজনে গেলাম চন্দ্রশেখরের স্টুড়িয়োতে।

প্রথমেই যেটার দিকে দৃষ্টি দিয়ে ফেলুদা থেমে গেল সেটা হল ঘরের মাঝখানের টেবিলটা।

এর ওপর একটা ব্রঞ্জের মূর্তি ছিল না—একটা ঘোড়সওয়ার?

ঠিক বলেছেন। ওটা ইন্সপেক্টর মণ্ডল নিয়ে গেলেন আঙুলের ছাপ নেওয়ার জন্য। ওঁর ধারণা ওটা দিয়েই খুনটা করা হয়েছে।

হুঁ।

এবার আমরা তিনজনেই দক্ষিণের দেয়ালের কোণের ছবিটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

আজ যেন যীশুর জৌলুস আরও বেড়েছে। কেউ পরিষ্কার করেছে কি ছবিটাকে?

ফেলুদা এক পা এক পা করে এগিয়ে গিয়ে ছবিটার একেবারে কাছে দাঁড়াল। তারপর মিনিটখানেক সেটার দিকে চেয়ে থেকে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল।

ইটালিতে রেনেসাঁসের যুগে মিনি-শ্যামাপোকা ছিল কি?

মিনি-শ্যামপোকা? নবকুমারবাবুর চোখ কপালে উঠে গেছে।

আজকাল তিনরকম শ্যামাপোকা হয়েছে জানেন তো? মিনি, মিডি আর ম্যাক্সি। ম্যাক্সিগুলো সাদা, সবুজ নয়। মিনিগুলো রেগুলার কামড়ায়। সবুজ মিডিগুলো অবিশ্যি চিরকালই ছিল। কিন্তু ষড়বিংশ শতাব্দীর ভেনিসে ছিল কি না সে বিষয় আমার সন্দেহ আছে।

ভেনিসে না হাক, এই বৈকুণ্ঠপুরে তো আছেই। কাল রাত্রেও হয়েছিল।

তা হলে দুটো প্রশ্ন করতে হয়, বলল ফেলুদা, প্রাচীন পেন্টিং-এর শুকনা রঙে সে পোকা আটকায় কী করে, আর যে ঘরে বাতি জ্বলে না সে ঘরে পোকা আসে কী করে।

তার মানে– ?

তার মানে এ ছবি আসল নয়, মিস্টার নিয়োগী। আসল ছবিতে যীশুরু কপালে শ্যামপোকা ছিল না, আর ছবির রংও এত উজ্জ্বল ছিল না। এ ছবি গত দু-এক দিনে আঁকা হয়েছে

মূল থেকে কপি করে। কাজটা রাত্তিরে মামবাতি বা কেরোসিনের বাতি জ্বলিয়ে হয়েছে, আর সেই সময় একটি শ্যামপোকা ঢুকে যীশুর কপালের কাঁচা রঙে আটকে গেছে।

নবকুমারবাবুর মুখ ফ্যাকাসে।

তা হলে আসল ছবি-?

আসল ছবি সরিয়ে ফেলা হয়েছে মিস্টার নিয়োগী। খুব সম্ভবত আজ ভোরেই। এবং কে সরিয়েছে সেটা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

৮. রুদ্রশেখরের কথা (২)

গুড আফটারনুন, মিস্টার নিয়োগী।

গুড আফটারনুন।

রুদ্রশেখর এগিয়ে এসে সোমানির বিপরীত দিকে একটা চেয়ারে বসলেন। দুজনের মাঝখানে একটা প্রশস্ত আধুনিক ডেস্ক। আপিসঘরটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও চারিদিক থেকে বন্ধ। তাই শহরের কোনও শব্দই এখানে পৌঁছায় না। পাশের শেলফের উপর ঘড়িটা ইলেকট্রনিক, তাই সেটাও নিঃশব্দ।

আপনি কি ছবিটা পেয়েছেন? প্রশ্ন করলেন। হীরালাল সোমানি।

রুদ্রশেখর নিয়োগী কোনও জবাব দেওয়ার পরিবর্তে বললেন, আপনি তো আরেকজনের হয়ে ছবিটা কিনতে চান, তাই না?

হীরালাল একদৃষ্ট্রে চেয়ে রইলেন রুদ্রশেখরের দিকে, ভাবটা যেন তিনি প্রশ্নটা শুনতেই পাননি।

আমি সেই ভদ্রলোকের নাম-ঠিকনাটা চাইতে এসেছি, বললেন রুদ্রশেখর নিয়োগী।

হীরালাল ঠিক সেই ভাবেই চেয়ে থেকে বললেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করছি মিঃ নিয়োগী-ছবিটা কি এখন আপনার হাতে?

সেটা বলতে আমি বাধ্য। নই।

তা হলে আমিও ইনফরমেশন দিতে বাধ্য নই।

এবার দেবেন কি?

রুদ্রশেখর বিদ্যুদ্বেগে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার হাতে একটা একটি রিভলভার, সোজা। হীরালালের দিকে তাগ করা।

বলুন মিঃ সোমানি। আমার জানা দরকার। আমি আজই সে লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই।

টেবিলের তলায় সোমানি যে তাঁর বাঁ হাঁটু দিয়ে একটি বোতামে চাপ দিয়েছেন, এবং দেওয়ামাত্র রুদ্রশেখরের পিছনের একটি ঘরের দরজা খুলে গিয়ে দুটি লোক বেরিয়ে এসে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছে, সেটা তাঁর জানার উপায় ছিল না।

পরমুহূর্তেই রুদ্রশেখর দেখলেন যে তিনি মোক্ষম প্যাঁচে পড়েছেন।

একটি লোক তার ডান হাতটা ধরে তাতে মোচড় দেওয়াতে রিভলভারটা এখন তারই হাতে চলে গেছে, এবং সেটি এখন রুদ্রশেখরের দিকেই তাগ করা।

পালাবার কোনও চেষ্টায় ফল হবে না। মিঃ নিয়োগী। এই দুজন লোক আপনার সঙ্গে গিয়ে আপনার কাছ থেকে ছবিটা নিয়ে আসবে। আশা করি আপনি মূখের মতো বাধা দেবেন না।

বিশ মিনিটের মধ্যে লোক দুজন সমেত রুদ্রশেখর একটি ফিয়াট গাড়িতে করে সদর স্ট্রিটের একটি হোটেলে পৌঁছে গেলেন। আপাতদৃষ্টিতে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়– দুটি লোককে সঙ্গে নিয়ে রুদ্রশেখর তাঁর ঘরে চলেছেন। দুজনের একজনের হাত কোটের পকেটে ঠিকই, কিন্তু সে হাতে যে রিভলভার ধরা সেটা বাইরের লোকে বুঝবে কী করে?

উনিশ নম্বর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবার পর রিভলভার বেরিয়ে এল কোটের পকেট থেকে। রুদ্রশেখর বুঝলেন কোনও আশা নেই, তাঁকে আদেশ মানতেই হবে।

সুটকেস বিছানার উপর রেখে চাবি দিয়ে ডালা খুলে একটা শবরের কাগজে মোড়া পাতলা বোর্ড বার করে আনেন রুদ্রশেখর।

যে লোকটির হাতে রিভলভার নেই। সে মোড়কটা ছিনিয়ে নিয়ে খবরের কাগজের র‍্যাপিং খুলতেই বেরিয়ে পড়ল যীশু খ্রিষ্টের ছবি।

লোকটা ছবিটা আরার কাগজে মুড়ে পকেট থেকে প্রথমে একটি সিস্কের রুমাল বার করে তাই দিয়ে রুদ্রশেখরের মুখ বাঁধল।

তারপর একটি মেক্ষম ঘুষিতে তাকে অজ্ঞান করে মেঝেতে ফেলে, নাইলনের দড়ির সাহায্যে আষ্ট্রেপৃষ্ঠে বেঁধে সেইভাবেই ফেলে রেখে দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পনেরো মিনিটের মধ্যে যীশু খ্রিষ্টের ছবি হীরালাল সোমানির কাছে পৌঁছে গেল। সোমানি ছবিটার উপর চোখ বুলিয়ে দুটির একটি লোকের হাতে দিয়ে বললেন, এটা ভাল করে প্যাক করো।

তারপর অন্য লোকটিকে বললেন, একটা জরুরি টেলিগ্রাম লিখে দিচ্ছি। এখুনি পার্ক স্ট্রিট পোস্টাপিসে চলে যাও। টেলিগ্রাম আজকের মধ্যেই যাওয়া চাই।

সোমানি টেলিগ্রাম লিখলেন–

মিঃ ওয়ালটার ক্রিকোরিয়ান
ক্রিকোরিয়ান এন্টারপ্রাইজেজ
১৪ হেনেসি স্ট্রিট
হংকং
অ্যারাইভিং স্যাটারডে নাইনথ অক্টোবর
–সোমানি।

৯. ইন্সপেক্টর মহাদেব মণ্ডল

সন্ধের দিকে ইন্সপেক্টর মণ্ডল এলেন। মহাদেব মণ্ডল। নামটা শুনলেই যে একটা গোলগাল নাদুসনুদুস চেহারা মনে হয়, মোটেই সেরকম নয়। বরং একেবারেই উলটো। লালমোহনবাবু পরে বলেছিলেন, নামের তিনভাগের দুভাগই যখন রোগা, তখন এটাই স্বাভাবিক, যদিও সচরাচর এটা হয় না। এখানে অবিশ্যি নাম বলতে লালমোহনবাবু দারোগা বোঝাতে চেয়েছিলেন।

দেখলাম ফেলুদার নাম যথেষ্ট জানা আছে ভদ্রলোকের।

আপনি তো খড়গপুরের সেই জোড়া খুনের রহস্যটা সমাধান করেছিলেন, তাই না? সেভেনটি এইটে?

যমজ ভাইয়ের একজনকে মারার কথা, কোনও রিস্ক না নিয়ে দুজনকেই খুন করেছিল এক ভাড়াটে গুণ্ডা। ফেলুদার খুব নামডাক হয়েছিল কেসটাতে।

ফেলুদা বলল, বর্তমান খুনের ব্যাপারটা কী বুঝেছেন?

খুনি তো যিনি ভেগেছেন তিনিই বললেন ইন্সপেক্টর মণ্ডল। এ বিষয়ে তো কোনও ডাউট নেই, কিন্তু কথাটা হচ্ছে মোটিভ নিয়ে।

একটা মহামূল্য জিনিস নিয়ে খুনি ভেগেছেন সেটা জানেন কি?

এটা আবার কী ব্যাপার?

এটা আবিষ্কারের ব্যাপারে আমার সামান্য অবদান আছে।

জিনিসটা কী?

একটা ছবি! স্টুডিয়োতেই ছিল। সেই ছবিটা নেবার সময় বঙ্কিমবাবু গিয়ে পড়লে পরে খুনটা অসম্ভব নয়।

তা তো বটেই।

আপনি সাংবাদিক ভদ্রলোকটিকে জেরা করেছেন?

করেছি বইকী। সত্যি বলতে কী, দু-দুটি সম্পূর্ণ অচেনা লোক একই সঙ্গে বাড়িতে এসে রয়েছে এটা খুবই খটকার ব্যাপার। ওঁর ওপরেও যে আমার সন্দেহ পড়েনি তা না, তবে জেরা করে মনে হল লোকটি বেশ স্ট্রেট-ফরওয়ার্ড, কথাবাতাও পরিষ্কার। তা ছাড়া, যে মূর্তিটা মাথায় মেরে খুন করা হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস, তাতে স্পষ্ট আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। তার সঙ্গে এনার আঙুলের ছাপ মেলে না।

রুদ্রশেখরবাবুর ট্যাক্সির খোঁজটা করেছেন? ডরু বি টি ফোর ওয়ান ডবল টু?

বা-বা, আপনার তো খুব মেমরি!—খোঁজ করা হয়েছে বই কী। পাওয়া গেছে সে ট্যাক্সি; রুদ্রশেখরকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে সদর স্ট্রিটে একটা হোটেলে নামায়। সে হোটেলে খোঁজ করে ভদ্রলোককে পাওয়া যায়নি। অন্য হোটেলগুলোতেও নাম এবং চেহারার বর্ণনা দিয়ে খোঁজ করা হচ্ছে, কিন্তু এখনও কোনও খবর আসেনি। মহামূল্য ছবি যদি নিয়ে থাকে তা হলে তো সেটাকে বিক্রি করতে হবে। সে কাজটা কলকাতায় হবারই সম্ভাবনা বেশি।

সে ব্যাপারে পুরোপুরি ভরসা করা যায় বলে মনে হয় না।

আপনি বলছেন শহর ছেড়ে চলে যেতে পারে?

দেশ ছেড়েও যেতে পারে।

বলেন কী?

আমার যদ্দুর ধারণা আজই হংকং-এ একটা ফ্লাইট আছে।

হংকং! এ যে আন্তজাতিক পুলিশের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে মশাই! হংকং চলে গেলে আর মহাদেব মণ্ডল কী করতে পারে বলুন!

হংকং যে গেছে এমন কোনও কথা নেই। তবে আপনি না পারলেও আমাকে একটা চেষ্টা দেখতেই হবে।

আপনি হংকং যাবেন? বেশ কিছুটা অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন নবকুমারুবাবু।

আরও দু-একটা অনুসন্ধান করে নিই বলল ফেলুদা, তারপর ডিসাইড করব।

যদি যাওয়া স্থির করেন তো আমাকে জানাবেন। ওখানে একটি বাঙালি ব্যবসাদারের সঙ্গে খুব আলাপ আছে আমার। পূর্ণেন্দু পাল। আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। ভারতীয় হ্যাঁন্ডিক্রাফটসের দোকান আছে। সিন্ধি-পাঞ্জাবিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মন্দ করছে না।

বেশ তো। আমি গেলে তাঁর ঠিকানা নিয়ে নেব আপনার কাছে।

ঠিকানা কেন? আমি তাকে কেবল করে জানিয়ে দেব, সে আপনাদের এসে মিট করবে: এয়ারপোর্টে। প্রয়োজনে তার ফ্ল্যাটেই থাকতে পারেন। আপনারা।

ঠিক আছে, ঘুরে আসুন, ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন মিঃ মণ্ডল, যদি পারেন আমার জন্য কিছু বিলিতি ব্লেড নিয়ে আসবেন তো মশাই। আমার দাড়ি বড় কড়া। দিশি ব্লেডে শানায় না?

মিঃ মণ্ডল বিদায় নিলেন।

যাক, তা হলে শেষমেষ আমাদের পাসপোর্টটা কাজে লাগল, আমরা তিনজনে আমাদের ঘরে গিয়ে বসার পর বললেন লালমোহনবাবু। দু বছর আগে বম্বের প্রেসিডোন্ট হোটেলের একজন আরব বাসিন্দা খুন হয়। ফেলুদার বন্ধু বম্বের ইন্সপেক্টর পটবর্ধন মারফত কেসটা

ফেলুদার হাতে আসে। সেই সূত্রেই আমাদের আবু ধাবি যাবার কথা হয়েছিল। সব ঠিক, পাসপোর্ট-টাসপোর্ট রেডি, এমন সময় খবর আসে খুনি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। —কান ঘেষে বেরিয়ে গেল, তপেশ ভাই! আক্ষেপ করে বলেছিলেন লালমোহনবাবু। কাঠমাণ্ডু ফরেন কান্ট্রি ঠিকই, কিন্তু পাসপোর্ট দেখিয়ে ফরেনে যাবার একটা আলাদা ইয়ে আছে।

সেই ইয়েটা এবার হলেও হতে পারে।

লালমোহনবাবু, হংকং-এর ক্রাইম রেট সম্বন্ধে কী একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিলেন, এমন। সময় দরজার বাইরে একটা মৃদু কাশির শব্দ পেলাম।

আসতে পারি?

সাংবাদিক রবীন চৌধুরীর গলা।

ফেলুদা আসুন বলতে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে এলেন। আমার আবার মনে হল এঁকে যেন আগে দেখছি, কিন্তু কোথায় সেটা বুঝতে পারলাম না।

ফেলুদা চেয়ার এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোকের দিকে।

আপনি শুনলাম ডিটেকটিভ? বসে বললেন ভদ্রলোক।

আজ্ঞে হ্যাঁ। সেটাই আমার পেশা।

জীবনী লেখার কাজটাও অনেক সময় প্রায় গোয়েন্দাগিরির চেহারা নেয়। এক-একটা নতুন তথ্য এক-একটা কু-এর মতো নতুন দিক খুলে দেয়।

আপনি চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে নতুন কোনও তথ্য পেলেন নাকি?

স্টুডিয়া থেকে চন্দ্রশেখরের দুটো বাক্স আমি আমার ঘরে নিয়ে এসেছিলাম। তাতে বেশির ভাগই চিঠি, দলিল, ক্যাশমেমো, ক্যাটালগ ইত্যাদি, কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু খবরের কাগজের কাটিং-ও ছিল। তার মধ্যে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দেখুন।

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা খবরের কাগজের টুকরো বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন। তার একটা অংশ লাল পেনসিল দিয়ে মার্ক করা। তাতে লেখা–

La moglie Vittoria con in figlio Rajsekhar annuncio con profondo dolore la scomparsa del loro Rudrasekhar Neogi.

—Roma, Juli 27, 1955

এ তো দেখছি ইটালিয়ান ভাষা, বলল ফেলুদা।

হ্যাঁ, কিন্তু আমি ডিকশনারি দেখে মনে করেছি। এতে বলছে–স্ত্রী ভিত্তোরিয়া ও ছেলে রাজশেখর গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছে–লা স্কমপারসা দেল লোরো রুদ্রশেখর নিয়াগী– অর্থাৎ, দ্য লস অফ দেয়ার রুদ্রশেখর নিয়োগী।

মৃত্যু সংবাদ? ভুরু কুঁচকে বলল ফেলুদা।

রুদ্রশেখর ডেড? চোখ কপালে তুলে বললেন জটায়ু।

তা তো বটেই। এবং তিনি মারা যান ১৯৫৫ সালের সাতাশে জুলাই। তার সঙ্গে এটাও জানা যাচ্ছে যে তিনি বিয়ে করেছিলেন, এবং রাজশেখর নামে তাঁর একটি ছেলে হয়েছিল।

সর্বনাশ! এ যে বিস্ফোরণ! ফেলুদা খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।আমার নিজেরও সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু এই ভাবে হাতে-নাতে প্রমাণ পাওয়া যাবে সেটা ভাবতে পারিনি।

আপনি কবে পেলেন এটা?

আজই দুপুরে

ইস-লোকটা সট্‌কে পড়ল। কী মারাত্মক ধাপ্পাবাজি।

আমি কিন্তু প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলাম, কারণ আমি কোনও প্রশ্ন করলে হয়। উনি এড়িয়ে যাচ্ছিলেন, না হয় ভুল জবাব দিচ্ছিলেন। শেষে অবিশ্যি প্রশ্ন করা বন্ধই করে দিয়েছিলাম।

যাকগে। এই নিয়ে এঁদের এখন কিছু জানিয়ে কোনও লাভ নেই। এখন লোকটাকে ধরা নিয়ে কথা। তারপর অবিশ্যি শাস্তি যেটা দরকার সেটা হবে। আপনি সত্যিই গোয়েন্দার কাজ করেছেন। অনেক ধন্যবাদ।

রবীনবাবু চলে গেলেন। আমাদের অনেক উপকার করে গেলেন ঠিকই, কিন্তু তাও ওঁর সম্বন্ধে খাটুকা লাগছে কেন?

ওঁর শার্টের এক পাশে রক্তের দাগ কেন?

ফেলুদাকে বললাম।

লালমোহনবাবুও দেখেছেন দাগটা, এবং বললেন, হাইলি সাস্‌পিশাস্‌।

ফেলুদা শুধু গভীরভাবে একটা কথাই বলল, দেখেছি।

*

আমরা সন্ধে সাতটায় বৈকুণ্ঠপুর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। রওনা দেবার ঠিক আগে নবকুমারবাবু আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার করলেন। ফেলুদার হাতে একটা খাম গুঁজে দিয়ে বললেন, এই নিন মশাই, সামনে আপনাদের অনেক খরচ আছে। এতে কিছু আগাম দিয়ে দিলাম; আমাদেরই হয়ে আপনি তদন্তটা করছেন এ ব্যাপারে আপনার মনে যেন কোনও দ্বিধা না থাকে।

অনেক ধন্যবাদ।

আর আমি পূর্ণেন্দুকে কাল একটা টেলিগ্রাম করে দেব। আপনি যদি যান তা হলে ফ্লাইট নাম্বার জানিয়ে এই ঠিকানায় ওকে একটা তার করে দেবেন। ব্যস, আর কিছু ভাবতে হবে না।

খাম ছিল পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক।

জলি-রুদ্রশেখরকে খোঁজার কী করবেন? ফেরার পথে লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

ওঁর পাত্তা পাবার আশা কম, যদি বা ভদ্রলোক হংকং গিয়ে থাকেন।

গেছে কি না-গেছে সেটা জানছেন কী করে?

জানার কোনও উপায় নেই। তাকে দেশের বাইরে যেতে হলে তার নিজের নামে যেতে হবে; তার পাসপোর্টও হবে নিজের নামে। নবকুমারবাবুর বাবাকে যে পাসপোর্ট দেখিয়েছিলেন ভদ্রলোক, সেটা জাল ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধের পক্ষে সেটা ধরার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এয়ারপোর্টে তো আর সে ধাপ্পা চলবে না তার আসল নামটা যখন আমরা জানি না, তখন প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখে কোনও লাভ নেই।

তা হলে?

একটা ব্যাপার হতে পারে। আমার মনে হয়। সেই আর্মেনিয়ান ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা নিতে জাল-রুদ্রশেখরকে একবার হীরালাল সোমানির কাছে যেতেই হবে। সোমানি সম্বন্ধে যা শুনলাম, এবং তাকে যতটুকু দেখেছি, তাতে মনে হয় না। সে নাম ঠিকানা দেবে। এত বড় দও সে হাতছাড়া করবে না। ছলেবলে কৌশলে সে জাল-রুদ্রশেখরের হাত থেকে ছবিটা আদায় করবে। তারপর সেটা নিয়ে নিজেই হংকং যাবে সাহেবকে দিতে।

তা হলে তো সোমানির নাম খুঁজতে হবে প্যাসেঞ্জার লিস্টে।

তা তো বটেই। ওটার উপরই তো নির্ভর করছে আমাদের যাওয়া না-যাওয়া। লালমোহনবাবুর চট্ট করে চোখ কপালে তোলা থেকে বুঝলাম উনি একটা কুইক প্রার্থনা সেরে নিলেন যাতে হংকং যাওয়া হয়। যদি যাওয়া হয় তা হলে চিনে ভাষা শেখার প্রয়োজন হবে কি না জিজ্ঞেস করাতে ফেলুদা বলল, চিনে ভাষায় অক্ষর কটা আছে জানেন?

কটা?

দশ হাজার। আর আপনার জিভে প্লাস্টিক সার্জারি না করলে চিনে উচ্চারণ বেরোবে না। মুখ দিয়ে। বুঝেছেন?

বুঝলাম।

পরদিন সকালে আপিস খোলার টাইম থেকেই ফেলুদা কাজে লেগে গেল।

আজকাল শুধু এয়ার ইন্ডিয়া আর থাই এয়ারওয়েজে হংকং যাওয়া যায় কলকাতা থেকে। এয়ার ইন্ডিয়া যায় সপ্তাহে এক'দিন□–মঙ্গলবার, আর থাই এয়ারওয়েজ যায় সপ্তাহে তিনদিন-সোম, বুধ আর শনি–কিন্তু শুধু ব্যাঙ্কক পর্যন্ত; সেখান থেকে অন্য প্লেন নিতে হয়।

আজ শনিবার, তাই ফেলুদা প্রথমে থাই এয়ারওয়েজেই ফোন করল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্যাসেঞ্জার লিস্টের খবর জানা গেল।

আজই সকালে হীরালাল সোমানি হংকং চলে গেছেন।

আমরা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যেতে পারি আগামী মঙ্গলবার, অর্থাৎ তরশু।

তার মানে হংকং-এ তিনটে দিন হাতে পেয়ে যাচ্ছে হীরালাল সোমানি।

সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে আমরা যতদিনে পৌঁছাব ততদিনে ছবি সোমানির হাত থেকে সাহেবের হতে চলে যাবে।

তা হলে আমাদের গিয়ে কোনও লাভ আছে কি?

কথাগুলো অবিশ্যি ফেলুদাই বলছিল আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে।

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন–

টিনটোরেটোর ইটালিয়ান উচ্চারণটা কী মশাই?

তিনতোরোত্তো, বলল ফেলুদা।

নামের গোড়াতেই যখন তিন, আর আমি যখন আছি আপনাদের সঙ্গে, তখন মিশন সাকসেসফুল না হয়ে যায় না। –

যাবার ইচ্ছেটা আমারও ছিল পুরোমাত্রায়, বলল ফেলুদা, কিন্তু যাবার এত বড় একটা জাস্টিফিকেশন খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হত না।

১০. আমাদের হংকং যাওয়া

মঙ্গলবার ১২ই অক্টোবর রাত দশটায়। এয়ার ইন্ডিয়ার ৩১৬নম্বর ফ্লাইটে আমাদের হংকং যাওয়া। বোইং ৭০৭ আর ৭৩৭-এ ওড়ার অভিজ্ঞতা ছিল এর আগে, এবার ৭৪৭ জাম্বো-জেটে চড়ে আগের সব ওড়াগুলো ছেলেমানুষি বলে মনে হল।

প্লেনের কাছে পৌঁছে বিশ্বাস হচ্ছিল না যে এত বড় জিনিসটা আকাশে উড়তে পারে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভিতরে যাত্রীর ভিড দেখে সেটা আরও বেশি করে মনে হল। লালমোহনবাবু যে বলেছিলেন শুধু ইকনমি ক্লাসের যাত্রীতেই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম ভরে যাবে, সেটা অবিশ্যি বাড়াবাড়ি, কিন্তু একটা মাঝারি সাইজের সিনেমা হলের একতলাটা যে ভরে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

ফেলুদা গতকাল সকালেই পূর্ণেন্দুবাবুকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছে। আমরা হংকং পৌঁছাব আগামীকাল সকাল পৌনে আটটা হংকং টাইম—তার মানে ভারতবর্ষের চেয়ে আড়াই ঘণ্টা এগিয়ে।

যেখানে যাচ্ছি সেটা যদি নতুন জায়গা হয় তা হলে সেটা সম্বন্ধে পড়াশুনা করে নেওয়াটা ফেলুদার অভ্যাস, তাই ও গতকালই অক্সফোর্ড বুক অ্যান্ড স্টেশনারি থেকে হংকং সম্বন্ধে একটা বই কিনে নিয়েছে। আমি সেটা উলটে পালটে ছবিগুলো দেখে বুঝেছি হংকং-এর মতো এমন জমজমাট রংদার শহর খুব কমই আছে। লালমোহনবাবু উৎসাহে ফেটে পড়ছেন ঠিকই, কিন্তু যেখানে যাচ্ছেন সে-জায়গা সম্বন্ধে ধারণা এখনও মোটেই স্পষ্টই নয়। একবার জিজ্ঞেস করলেন চিনের প্রাচীরটা দেখে আসার কোনও সুযোগ হবে কি না। তাতে ফেলুদাকে বলতে হল যে চিনের প্রাচীর হচ্ছে পিপলস রিপাবলিক অফ চায়নায়, পিকিং-এর কাছে, আর হংকং হল ব্রিটিশদের শহর। পিকিং হংকং থেকে অন্তত পাঁচশো মাইল।

আবহাওয়া ভাল থাকলে জাম্বো জেটের মতো এমন মোলায়েম ঝাঁকানিশূন্য ওড়া আর কোনও প্লেনে হয় না। মাঝরাত্রে ব্যাঙ্ককে নামে প্লেনটা, কিন্তু যাত্রীদের এয়ারপোর্টে নামতে দেবে না শুনে দিব্যি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম।

সকালে উঠে জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি আমরা সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে চলেছি। তারপর ক্রমে দেখা গেল জলের উপর উচিয়ে আছে কচ্ছপের খোলার মতো সব ছোট ছাট দ্বীপ। প্লেন নীচে নামছে বলে দ্বীপগুলো ক্রমে বড় হয়ে আসছে, আর বুঝতে পারছি তার অনেকগুলোই আসলে জলে- ডুবে-থাকা পাহাড়ের চূড়ো।

সেগুলোর উপর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখতে পেলাম পাহাড়ের ঘন সবুজের উপর সাদার ছোপ।

আরও কাছে আসতে সেগুলা হয়ে গেল পাহাড়ের গায়ে থরে থরে সাজানো রোদে-চোখ-ঝলসানো বিশাল বিশাল হাইরাইজ।

হংকং-এ ল্যান্ডিং করতে হলে পাইলটের যথেষ্ট কেরামতির দরকার হয় সেটা আগেই শুনেছি। তিনদিকে সমুদ্রের মাঝখানে এক চিলতে ল্যান্ডিং স্ট্রিপ—হিসেবে একটু গণ্ডগোল হলে জলে ঝপাং, আর বেশি গণ্ডগোল হলে সামনের পাহাড়ের সঙ্গে দড়াম্।

কিন্তু এ দুটোর কোনওটাই হল না। মোক্ষম হিসেবে প্লেন গিয়ে নামল ঠিক যেখানে নামবার, থামল যেখানে থামবার, আর তারপর উলটা মুখে গিয়ে টার্মিন্যাল বিল্ডিং-এর পাশে ঠিক এমন জায়গায় দাঁড়াল যে চাকার উপর দাঁড় করানো দুটো চারকোনা মুখ-ওয়ালা সুড়ঙ্গ এসে ইকনমি ক্লাস আর ফাস্ট ক্লাসের দুটো দরজার মুখে বেমালুম ফিট করে গেল। ফলে আমাদের আর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হল না, সোজা দরজা দিয়ে বেরিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে টামিনাল বিল্ডিং-এর ভিতরে পৌঁছে গেলাম।

হংকং-এর জবাব নেই বললেন চোখ-ছানাবড়া লালমোহনবাবু।

এটা হংকং-এর একচেটে ব্যাপার নয় লালমোহনবাবু, বলল ফেলুদা।ভারতবর্ষের বাইরে পৃথিবীর সব বড় এয়ারপোর্টেই প্লেন থেকে সোজা টার্মিনাল বিল্ডিং-এ ঢুকে যাবার এই ব্যবস্থা।

হংকং-এ এক মাসের কম থাকলে ভিসা লাগে না, কাস্টমস-এও বিশেষ কড়াকড়ি নেই,- তাই বিশ মিনিটের মধ্যে সব ল্যাঠা চুকে গেল। লাগোজ ছিল সামান্যই, তিন জনের তিনটে ছোট সুটকেস, আর কাঁধে একটা করে ছোট ব্যাগ। সব মাল আমাদের সঙ্গেই ছিল।

ফাস্টমস থেকে বেরিয়ে এসে দেখি একটা জায়গায় লোকের ভিড়, তাদের মধ্যে একজনের হাতে একটা হাতলের মাথায় বোর্ডে লেখা পি. মিটার। বুঝলাম ইনিই হচ্ছেন পূর্ণেন্দু পাল। পরস্পরের মুখ চেনা নেই বলে এই ব্যবস্থা।

ওয়েলকাম টু হংকং, বলে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন পাল মশাই। নবকুমারবাবুরই বয়স, অর্থাৎ চল্লিশ-বেয়াল্লিশ-এর মধ্যেই। মাথায় টাক পড়ে গেছে, তবে দিব্যি চকচকে স্মার্ট চেহারা, আর গায়ের খয়েরি সুন্টটাও স্মার্ট আর চকচকে। ভদ্রলোক যে রোজগার ভালই করেন, আর এখানে দিব্যি ফুর্তিতে আছেন, সেটা আর বলে দিতে হয় না।

একটা গাঢ় নীল জামান ওপেল গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। আমরা। ভদ্রলোক নিজেই ড্রাইভ করেন। ফেলুদা ওঁর পাশে সামনে বসল, আমরা দুজন পিছনে। আমাদের গাড়ি রওনা দিয়ে দিল!

এয়ারপোর্টটা কাউলূনে, বললেন মিঃ পাল। আমার বাসস্থান এবং দাকান দুটোই হংকং-এ। কাজেই আমাদের বে পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে।

আপনার উপর এভাবে ভর করার জন্য সত্যিই লজ্জিত, বলল ফেলুদা।

ভদ্রলোক কথাটা উড়িয়েই দিলেন।

কী বলছেন মশাই। এটুকু করব না? এখানে একজন বাঙালির মুখ দেখতে পেলে কীরকম লাগে তা কী করে বলে বোঝাব? ভারতীয় গিজগিজ করছে। হংকং-এ, তবে বঙ্গসন্তান তো খুব বেশি নেই!

আমাদের হোটেলের কোনও ব্যবস্থা-?

হয়েছে, তবে আগে চলুন তো আমার ফ্ল্যাটে! ইয়ে, আপনি তো ডিটেকটিভ?

অজ্ঞে হ্যাঁ।

কোনও তদন্তের ব্যাপারে এসেছেন তো? হ্যাঁ।

একদিনের মামলা। কাল রাত্রেই আবার এয়ার ইন্ডিয়াতেই ফিরে যাব।

কী ব্যাপার বলুন তো।

নবকুমারবাবুদের বাড়ি থেকে একটি মহামূল্য পেন্টিং, চুরি হয়ে এখানে এসেছে। এনেছে সোমানি বলে এক ভদ্রলোক; হীরালাল সোমানি? সেটা চালান যাবে এক আর্মেনিয়নের হাতে। জিনিসটার দাম বেশ কয়েক লাখ টকা।

বলেন কী?

সেইটোকে উদ্ধার করতে হবে।

ওরে বাবা, এ তো ফিল্মের গপ্পো মশাই। তা এই আমেনিয়ানটি থাকেন কোথায়?

এঁর আপিসের ঠিকানা আছে আমার কাছে।

সোমানি কি কলকাতার লোক?

হ্যাঁ, এবং তিনি এসেছেন গত শনিবারের ফ্লাইটে। সে ছবি ইতিমধ্যে সাহেবের কাছে পৌঁছে গেছে।

সর্বনাশ! তা হলে?

তা হলেও সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করে ব্যাপারটা বলতে হবে। চোরাই মালি ঘরে রাখা তার পক্ষেও নিরাপদ নয়। সেইটে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

হুঁ...

পূর্ণেন্দুবাবুকে বেশ চিন্তিত বলে মনে হল।

লালমোহনবাবুকে একটু গম্ভীর দেখে গলা বেশি না তুলে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার। হংকংকে কি বিলেত-বলা চলে? জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

বললাম, তা কী করে বলবেন। বিলেত তো পশ্চিমে। এটা তো ফার ইস্ট। তবে বিলেতের যা ছবি দেখেছি তার সঙ্গে এর কোনও তফাত নেই।

ফেলুদার কান খাড়া, কথাগুলো শুনে ফেলেছে। বলল, আপনি চিন্তা করবেন না, লালমোহনবাবু। আপনার গড়পীরের বন্ধুদের বলবেন হংকংকে বলা হয় প্রাচ্যের লন্ডন। তাতেই ওঁরা যথেষ্ট ইমপ্রেস্‌ড হবেন।

প্রাচ্যের লন্ডন! গুড।

ভদ্রলোক প্রাচ্যের লন্ডন বলে বিড়বিড় করছেন, এমন সময় আমাদের গাড়িটা গোঁৎ খেয়ে একটা চওড়া টানেলের ভিতর ঢুকে গেল। সারবাঁধা হলদে বাতিতে সমস্ত টানেলের মধ্যে একটা কমলা আভা ছড়িয়ে দিয়েছে। পূর্ণেন্দুঝাবু বললেন আমরা নাকি জলের তলা দিয়ে চলেছি। আমাদের মাথার উপর হংকং বন্দর। আমরা বেরোব একেবারে হংকং-এর আলোয়।

লালমোহনবাবু বললেন, এমন দুর্দান্ত শহর, তার নামটা এমন হুপিং কাশির মতো হল কেন?

হংকং মানে কী জানেন তো? জিজ্ঞেস করলেন পূর্ণেন্দুবাবু।

সুবাসিত বন্দর, বলল ফেলুদা। বুঝলাম ও খবরটা পেয়েছে ওই বইটা থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ এই পথে চলার পর টানেল থেকে বেরিয়ে দেখলাম ছোট বড়-মাঝারি নানারকম জলযান সমেত পুরো বন্দরটা আমাদের পাশে বিছিয়ে রয়েছে, আর তারও পিছনে দূরে দেখা যাচ্ছে ফেলে আসা কাউলুন শহর।

আমাদের বাঁয়ে এখন বিশাল হাইরাইজ। কোনওটা আপিস, কোনওটা হোটেল, প্রত্যেকটারই নীচে লোভনীয় জিনিসে ঠাসা দোকানের সারি। পরে বুঝেছিলাম পুরো হংকং শহরটা একটা অতিকায় ডিপার্টমেন্ট স্টোরের মতো! এমন কোনও জিনিস নেই। যা হংকং-এ পাওয়া যায় না।

কিছুদূর গিয়ে বাঁয়ে ঘুরে দুটো হাইরাইজের মাঝখান দিয়ে আমরা আরেকটা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লাম।

এমন রাস্তা আমি কখনওই দেখিনি।

ফুটপাথ দিয়ে চলেছে কাতারে কাতারে লোক, আর রাস্তা দিয়ে চলেছে ট্যাক্সি, বাস, প্রাইভেট গাড়ি আর ডবলডেকার-ট্রাম। ট্রামের মাথা থেকে ডাণ্ডা বেরিয়ে তারের সঙ্গে লাগানো, কিন্তু রাস্তায় লাইন বলে কিছু নেই। রাস্তার দুপাশে রয়েছে দোকানের পর দোকান! তাদের সাইনবোর্ডগুলো দোকানের গা থেকে বেরিয়ে আমাদের মাথার উপর এমন ভাবে ভিড় করে আছে যে আকাশ দেখা যায় না। চিনে ভাষা লেখা হয় ওপর থেকে নীচে, তাই সাইনবোর্ডগুলোও ওপর থেকে নীচে, তার একেকটা আট-দশ হাত লম্বা।

ট্র্যাফিক প্রচণ্ড, আমাদের গাড়িও চলেছে। ধীরে, তাই আমরা আশ মিটিয়ে দেখে নিচ্ছি। এই অদ্ভুত শহরের অদ্ভুত রাস্তার চেহারাটা। কলকাতার ধরমতলাতেও ভিড় দেখেছি, কিন্তু সেখানে অনেক লোকের মধ্যেই যেন একটা যাচ্ছি-যাব ভাব, যেন তাদের হাতে অনেক সময়, রাস্তাটা যেন তাদের দাঁড়িয়ে আড্ডা মারার জায়গা। এখানের লোকেরা কিন্তু সকলেই ব্যস্ত, সকলেই হাঁটছে, সকলেরই তাড়া। বেশির ভাগই চিনে, তাদের কারুর চিনে পোশাক, কারুর বিদেশি পোষাক। এদেরই মধ্যে কিছু সাহেব-মেমও আছে। তাদের হাতে ক্যামেরা, চোখে কীতুহলী দৃষ্টি আর মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে এদিক ওদিক ঘাড় ঘোরানো থেকেই বোঝা যায় এরা টুরিস্ট।

অবশেষে এ-রাস্তাও পিছনে ফেলে একটা সরু রাস্তা ধরে একটা অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি অঞ্চলে এসে পড়লাম। আমরা। পরে জেনেছিলাম। এটার নাম প্যাটারসন স্ট্রিট। এখানেই একটা বত্রিশ তলা বাড়ির সাত তলায় পূর্ণেন্দুবাবুর ফ্ল্যাট।

গাড়ি থেকে যখন নামছি তখন আমাদের পাশ দিয়ে একটা কালো গাডি হঠাৎ স্পিড বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল আর ফেলুদা কেমন যেন একটু টান হয়ে গেল। এই গাড়িটাকে আমি আগেও আমাদের পিছনে আসতে দেখেছি। এদিকে পূর্ণেন্দুবাবু নেমেই এগিয়ে গেছেন। কাজেই আমাদেরও তাঁকে অনুসরণ করতে হল।

একটু হাত পা ছড়িয়ে বসুন স্যার, আমাদের নিয়ে তাঁর বৈঠকখানায় ঢুকেই বললেন পূর্ণেন্দুবাবু। দুঃখের বিষয় আমার এক ভাগনের বিয়ে, তাই আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে এই সেদিন রেখে এসেছি কলকাতায়। আশা করি আতিথেয়তার একটু-আধটু ত্রুটি হলে মাইন্ড করবেন না। –কী খাবেন বলুন।

সবচেয়ে ভাল হয় চা হলে, বলল ফেলুদা।

টি-ব্যাগস-এ আপত্তি নেই তো?

মোটেই না।

ঘরের উত্তর দিকে একটা বড় ছড়ানো জানালা দিয়ে হংকং শহরের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। লালমোহনবাবু দৃশ্য দেখছেন, আমি দেখছি সোনি কালার টেলিভিশনের পাশে আরেকটা যন্ত্র, সেটা নিশ্চয়ই ভিডিয়ো। তারই পাশে তিন তাক ভরা ভিডিয়ো ফিল্ম। তার মধ্যে বেশির ভাগই হিন্দি, আর অন্য পাশে টেবিলের উপর ডাই করা ম্যাগাজিন। ফেলুদা তারই খানকতক টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে আরম্ভ করেছে। মিঃ পাল ঘরে নেই। তাই এই ফাঁকে প্রশ্নটা না করে পারলাম না।

গাড়িতে কে ছিল ফেলুদা?

যে না-থাকলে আমাদের আসা বৃথা হত।

বুঝেছি।

হীরালাল সোমানি।

কিন্তু লোকটা কী করে জানল যে আমরা এসেছি?

খুব সহজ, বলল ফেলুদা। আমরা যে ভাবে ওর আসার ব্যাপারটা জেনেছি সেই ভাবেই! প্যাসেঞ্জার লিস্ট চেক করেছে। এয়ারপোর্টে ছিল নিশ্চয়ই। ওখান থেকে পিছু নিয়েছে।

লালমোহনবাবু জানালা থেকে ফিরে এসে বললেন, ছবি যদি পাচার হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে আর আমাদের পিছনে লাগার কারণটা কী?

সেটাই তো ভাবছি।

আসুন স্যার!

পূর্ণেন্দুবাবু ট্রে-তে চা নিয়ে এসেছেন, সঙ্গে বিলিতি বিস্কুট। টেবিলের উপর ট্রে-টা রেখে ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, আপনি যে ম্যান্ধাতার আমলের ফিল্মের পত্রিকায় মশগুল হয়ে পড়ালেন।

ফেলুদা একটা ছবি বেশ মন দিয়ে দেখতে দেখতে বলল, স্ক্রিন ওয়ার্লডের এই সংখ্যান্টা কি আপনার খুব কাজে লাগছে? এটা সেভেনটি-সিক্স- এর।

মোটেই না। আপনি স্বচ্ছন্দে নিতে পারেন। ওগুলো আমি দেখি না মশাই, দেখেন আমার গিন্নি। একেবারে ফিল্মের পোকা।

থ্যাঙ্ক ইউ। তোপ্‌সে, এই পত্রিকাটা আমার ব্যাগের মধ্যে ভরে দে তো। ইয়ে, আপনাদের এখানকার আপিসি-টাপিস খোলে কখন?

আর মিনিট দিশেকের মধ্যেই খুলে যাবে। আপনি সেই সাহেবকে ফোন করবেন তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

নম্বর আছে?

আছে।

ফেলুদা নোটবুক বার করল! –এই যে- ৫-৩১, ১৬৮৬।

হুঁ। হংকং-এর নম্বর। আপিসটা কোথায়?

হেনেসি স্ট্রিট। চোদ্দো নম্বর।

হুঁ। আপনি দশটায় ফোন করলেই পাবেন।

আমাদের হোটেল কোনটা ঠিক করেছেন জানতে পারি কি?

পার্ল হোটেল। এখান থেকে হেঁটে পাঁচ মিনিট। তাড়া কীসের? দুপুরের খাওয়াটা সেরে যাবেন এখন। কাছেই খুব ভাল ক্যান্টনিজ রেস্টোরান্ট আছে। তারপর, আপনাদের মিশন যদি আজ স্যাকসেসফুল হয়, তা হলে কাল নিয়ে যাব কাউলুনের এক রেস্টোরান্টে। এমন একটা জিনিস খাওয়াব যা কখনও খাননি।

কী জিনিস মশাই? লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।এরা তো আরশোলাটারশোলাও খায় বলে শুনিচি।

শুধু আরশোলা কেন, বলল ফেলুদা, আরশোলা, হাঙরের পাখনা, বাঁদরের ঘিলু, এমন কী সময় সময় কুকুরের মাংস পর্যন্ত।

স-স-স-স্নেক? লালমোহনবাবুর চোখ-নাক সব একসঙ্গে কুঁচকে গেল।

স্নেক।

মানে সাপ? সাপ?

সর্প। সাপের সুপ, সাপের মাংস, ফ্রাইড স্নেক-সব পাওয়া যায়।

খেতে ভাল?

অপূর্ব। ব্যাঙের মাংস তো অতি সুস্বাদু জিনিস, জানেন বোধহয়। তা ব্যাঙের ভক্ষক কেন ভাল হবে না খেতে বলুন।

লালমোহনবাবু যদিও বললেন তা বটে, কিন্তু যুক্তি পুরোপুরি মানলেন বলে মনে হল না।

ফেলুদা উঠে পড়েছে।

যদি কিছু মনে না করেন—আপনার টেলিফোনটা....

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

ফেলুদা আর্মেনিয়ান সাহেবের নম্বরটা ডায়াল করল। এ ডায়ালিং আমাদের মতো ঘুরিয়ে ডায়ালিং নয়। এটা বোতাম টিপে ডায়ালিং, টেপার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন নম্বরে বিভিন্ন সুরে একটা পি শব্দ হয়।

আমি একটু ক্রিকোরিয়ান সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

কোথায় গেছেন?

তাইওয়ান।

কবে।

গত শুক্রবার; আজি সন্ধ্যায়, ফিরবেন।

থ্যাঙ্ক ইউ।

ফেলুদা ফোন রেখে তারপর কী কথা হয়েছে সেটা বলল আমাদের।

তার মানে সে ছবি তো এখনও সোমানির কাছেই আছে, বললেন পূর্ণেন্দুবাবু।

তই তো মনে হচ্ছে বলল, ফেলুদা। তার মানে আমাদের এখানে আসাটা ব্যর্থ হয়নি।

১১. পূর্ণেন্দুবাবু বললেন

ইয়ুং কিং রেস্টোরান্টে আমাদের দুর্দান্ত ভাল চিনে খাবার খাইয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে পূর্ণেন্দুবাবু বললেন, আপনাদের তিনটের আগে যখন হোটেলে যাবার দরকার নেই তখন কিছু কেনাকাটার থাকলে এই বেলা সেরে নিন। অবিশ্যি কালকেও সময় পাবেন। আপনাদের ফ্লাইট তো সেই রাত দশটায়।

কিনি বা না কিনি, দু-একটা দাকানে অন্তত একটু উঁকি দিতে পারলে ভাল হত, বলল ফেলুদা।

আমার দোকানে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু সে তো ভারতীয় জিনিস। আপনাদের ইন্টারেস্ট হবে না বোধহয়।

লালমোহনবাবুর একটা পকেট ক্যালকুলেটার কেনার শখ-বইয়ের বিক্রির হিসেবটা নাকি চেক করতে সুবিধে হয়–তাই ইলেকট্রনিক্সের দোকানেই যাওয়া স্থির হল!

আমার চেনা দাকানে নিয়ে যাচ্ছি বললেন পূর্ণেন্দুবাবু, জিনিসও ভাল পাবেন, দামেও এদিক ওদিক হবে না।

ফেলুদা আর লালমোহনবাবু দুজনেই তাদের প্রাপ্য পাঁচশো ডলার নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে। তাই হংকং-এর মতো জায়গা থেকে কিছু কেনা হবে না এটা হতেই পারে না।

লী ব্রাদারসে ইলেকট্রনিক্স-এর সব কিছু ছাড়াও ক্যামেরার জিনিসপত্রও পাওয়া যায়। আমার সঙ্গে ফেলুদার পেনাট্যাক্স, তার জন্য কিছু রঙিন ফিল্ম কিনে নিলাম। আজ আর সময় হবে না, কিন্তু কাল মা-বাবার জন্যে কিছু কিনে নিতে হবে। লালমোহনবাবু যে ক্যালকুলেটারটা কিনলেন সেটা এত ছোট আর চ্যাপটা যে তার মধ্যে কোথায় কী ভাবে ব্যাটারি থাকতে পারে সেটা আমার মাথায় ঢুকল না। ফেলুদা একটা ছোট্ট সোনি ক্যাসেট

রেকর্ডার কিনে আমাকে দিয়ে বলল, এবার থেকে মক্কেল এলে এটা অন করে দিবি। কথাবার্তা রেকর্ড করা থাকলে খুব সুবিধে হয়।

দোকানের পাট সেরে তিনটে নাগাদ আবার পূর্ণেন্দুবাবুর বাড়িতে গিয়ে আমাদের মালপত্র তুলে রওনা দিলাম। পূর্ণেন্দুবাবুকে একবার দাকানে যেতে হবে, এবং সেটা আমাদের হোটেলের উলটো দিকে, তাই আমরা ট্যাক্সিতেই যাব পার্ল হোটেলে।

আমি কিন্তু চিন্তায় থাকব। মশাই বললেন পূর্ণেন্দুবাবু।কী হল না-হল একটা ফোন করে জানিয়ে দেবেন।

রাস্তায় বেরিয়ে সামনেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। মাথাটা রুপোলি, গা-টা লাল–এই হল হংকং ট্যাক্সির রং। লম্ব আমেরিকান গাড়ি, তিনজনে উঠে। পিছনে বসলাম।

পার্ল হোটেল, বলল ফেলুদা।

ট্যাক্সি ফ্ল্যাগ ডাউন করে চলতে আরম্ভ করল।

লালমোহনবাবুর কিছুক্ষণ থেকেই একটা ঝিম-ধরা নেশা-করা ভাব লক্ষ করছিলাম। জিজ্ঞেস করতে বললেন সেটা অল্প সময়ে মনের প্রসার প্রচণ্ড বেড়ে যাওয়ার দরুন। আর বাড়লে নাকি সামলানো যাবে না। –কলকাতায় কেবল চিনে ছুতোর মিস্ত্রি আর চিনে জুতোর দোকানের কথাই শুনিচি। তারা যে এমন একখানা শহর গড়তে পারে সেটা চক্ষুষ না দেখলে বিশ্বাস করতুম না মশাই।

পূর্ণেন্দুবাবু বলেছিলেন পায়ে হেঁটে পার্ল হোটেলে যেতে লাগে পাঁচ মিনিট। অলি গলি দিয়ে দশ মিনিট চলার পরেও যখন পার্ল হোটেল এল না, তখন বেশ ঘাবড়ে গেলাম। ব্যাপার কী? ফেলুদা আরেকবার গলা চড়িয়ে বলে দিল, পার্ল হোটেল। উই ওয়ন্ট পার্ল হোটেল।

উত্তর এল-ইয়েস, পার্ল হোটেল। কালো কোট, কালো চশমা পরা ড্রাইভার, ভুল শুনেছে এটাও বলা চলে না, আর একই নামে দুটো হোটেল থাকবে সেটাও অবিশ্বাস্য।

প্রায় কুড়ি মিনিট চলার পর ট্যাক্সিটা একটা রাস্তার মোড়ে এসে থামল।

এটা যে একেবারে চিনে পাড়া তাতে কোনও সন্দেহ নেই। রাস্তার দু-দিকে সারবাঁধা আট-দশ তলা বাড়ি। সেগুলোর প্রত্যেকটির জানালায় ও ছোট ছোট ব্যালকনিতে কাপড় শুকোচ্ছে, বাইরে থেকেই বোঝা যায়। ঘরগুলোতে বিশেষ আলো বাতাস ঢোকে না; দোকান যা আছে তার মধ্যে টুরিস্টের মাথা-ঘোরানো হংকং-এর কোনও চিহ্ন নেই। সব দোকানের নামই চিনে ভাষায় লেখা, তাই বাইরে থেকে কীসের দোকান তা বোঝার উপায় নেই।

পার্ল হোটেল—হায়্যার? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

লোকটা হাত বাড়িয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিল সামনের ডাইনের গলিটায় যেতে হবে।

মিটারে ভাড়া বলছে হংকং ডলারে, সেটা হিসেব করে দাঁড়ায় প্রায় একশো টাকার মতো। উপায় নেই। তাই দিয়ে আমরা তিনজন মাল নিয়ে নেমে পড়লাম। আমি আর লালমোহনবাবুর দিকে চাইছি না, জানি তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, হংকং-এ ক্রাইমের বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছেন সবই এখন বিশ্বাস করছেন।

যে গলিটার দিকে ড্রাইভার দেখিয়েছে সেটায় সূর্যের আলো কোনওদিন প্রবেশ করে কি না জানি না; অন্তত এখন তো নেই।

আমরা মোড় ঘুরে গলিটায় ঢুকলাম, আর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কেখেকে করা যেন এসে আমাদের ঘিরে ফেলল, আর তার পরমুহূর্তেই মাথায় একটা মোক্ষম বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাক- আউট।

যখন জ্ঞান হল তখন বুঝতে পারলাম একটা ঘুপচি ঘরের মেঝেতে পড়ে আছি। ফেলুদা আমার পাশে একটা কাঠের প্যাকিং কেসের উপর বসে চারমিনার খাচ্ছে। একটা অদ্ভুত গন্ধে মাথাটা কীরকম ভার ভার লাগছে। পরে জেনেছিলাম সেটা আফিং-এর গন্ধ। ব্রিটিশরা নাকি ভারতবর্ষের আফিং চিনে বিক্রি করে প্রচুর টাকা করেছিল, আর সেই সঙ্গে চিনেদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল আফিং-এর নেশা।

লালমোহনবাবু এখনও অজ্ঞান, তবে মাঝে মাঝে নড়ছেন-চড়ছেন, তাই মনে হয় এবার জ্ঞান ফিরবে।

আমাদের মালপত্র? নেই।

ঘরে গোটাপাঁচেক ছোট বড় প্যাকিং কেস, একটা কগত হয়ে পড়ে থাকা বেতের চেয়ার, দেয়ালে একটা চিনে ক্যালেন্ডার-ব্যস, এ ছাড়া কিছু নেই। বাঁ দিকের দেয়ালে প্রায় দেড় মানুষ উঁচুতে একটা ছোট্ট জানালা, তাই দিয়ে ধোঁয়া মেশানো একটা ফিকে আলো আসছে। বোঝা যাচ্ছে দিনের আলো এখনও ফুরোয়নি। ডাইনে আর সামনে দুটো দরজা, দুটোই বন্ধ। শব্দের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি। চিনেরা খাঁচায় পাখি রাখে। এটা অনেক জায়গায় লক্ষ করেছি, এমন কী দোকানেও।

উঠুন লালমোহনবাবু, বলল ফেলুদা, আর কত ঘুমোবেন।

লালমোহনবাবু চোখ খুললেন, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ কুঁচকোনোতে বুঝলাম মাথার যন্ত্রণাটা বেশ ভাল ভাবেই অনুভব করছেন।

উঃ, কী ভয়ংকর অভিজ্ঞতা! কোনওমতে উঠে বসে বললেন ভদ্রলোক। এ কোথায় এনে ফেলেছে আমাদের?

গুম ঘর, বলল ফেলুদা।একেবারে আপনার গল্পের মতো, তাই না?

আমার গল্প? ছোঃ!

ছোঃ বলতেই বোধহয় মাথাটা একটু ঝনঝনি করে উঠেছিল, তাই নাকটা কুঁচকে একটু থেমে। এবার গলাটা খানিকটা নামিয়ে নিয়ে বললেন—

যা ঘটল। তার কাছে গল্প কোন ছার? সব ছেড়ে দেব মশাই। ঢের হয়েছে। হন ডুরাস ড্যাড্যাড্যাং, ক্যাম্বোডিয়ায় কচকচি আর ভ্যানকুভারের ভ্যানভ্যাননি—দুর্ দুর্!

আর লিখবেন না বলছেন?

নেভার।

আপনার এই স্টেটমেন্ট কিন্তু রেকর্ড হয়ে গেল। এর পরে আবার লিখলে কিন্তু কথার খেলাপ হবে।

ফেলুদার পাশেই রাখা আছে তার নতুন কেনা। ক্যাসেট রেকডার। আর কিছু করার নেই তাই ওটা নিয়েই খুঁটুর খাটুর করছে। রেকর্ডিং-এর কথাটা যে মিথ্যে বলেনি সেটা ও প্লে-ব্যাক করে জানিয়ে দিল।

এ তো সোমানিরই কীর্তি বলে মনে হচ্ছে, বললেন লালমোহনবাবু।

নিঃসন্দেহে। এখন আমাদের লাগেজটা ফেরত পেলে হয়। রিভলভারটা গেছে। কী ভাগ্যি রেকর্ডারটা নেয়নি।

দুটো যে দরজা দেখছি, দুটোই কি বন্ধ?

সামনেরটা বন্ধ। পাশেরটা খোলা যায়। ওটা বাথরুম।

ওটাতে পালাবার পথ নেই বোধহয়?

দরজা একটা আছে। বাইরে থেকে বন্ধ। জানালা দিয়ে মাথা গলবে, ধড় গলবে না।

লালমোহনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের উপর মাথা রেখে আবার শুয়ে পড়লেন।

মিনিট খানেক পরে দেখি ভদ্রলোক গুনগুন করে গান গাইছেন। অনেক কষ্টে চিনতে পারলাম গানটা। হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে।

কড়িকাঠের দিকে চেয়ে কী ভাবছেন মশাই?

মাথায় ঘা খেয়ে অজ্ঞান হয়েও যে লোকে স্বপ্ন দেখে সেটা এই এক্সপেরিয়েন্সটা না হলে জানতুম না।

কী স্বপ্ন দেখলেন?

এক জায়গায় ডজনখানেক বাঁদর বিক্রি হচ্ছে, আর একটা লোক ডুগডুগি বাজিয়ে বলছে– রেনেসাঁসকা সুবাসিত বান্দর–রেনেসাঁসকা সুবাসিত বান্দর–দো দো ডলার–দো দো–

ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ। সিঁড়ি দিয়ে উঠছে লোক। তার মানে বাইরে বারান্দা।

সামনের দরজা চাবি দিয়ে খোলা হল।

একজন কালো সুট পরা ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। পিছনে আবছা অন্ধকারে আরও দুটো লোক রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। তিনজনেই ভারতীয়।

যিনি ঢুকলেন তিনি হচ্ছেন। হীরালাল সোমানি। চোখে মুখে বিশ্রী একটা বিদ্রূপের হাসি।

কী, মিস্টার মিত্তির? কেমন আছেন?

আপনারা যেমন রেখেছেন।

আপনি ঘাবড়াবেন না। আপনাকে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিইনি। আমি। আমার কাম হয়ে গেলেই খালাস করে দেব।

আমাদের মালগুলো সরিয়ে রাখার কী কারণ বুঝতে পারলাম না।

দ্যাট ওয়জ এ মিসটেক; কানহাইয়া! কানহাইয়া!

দুজন লোকের একজন কোথায় চলে গিয়েছিল, সে ডাক শুনে ফিরে এল। এতক্ষণে বুঝতে পারছি যে অন্য লোকটি সোমানির পিছনে দাঁড়িয়ে রিভলভার উঁচিয়ে রয়েছে।

ইনলোগক সামান লাকে রুখ দৌ ইস্ কামরোমে, কানহাইয়াকে আদেশ করলেন হীরালাল। তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, এখানে ডিনারের অ্যারেঞ্জমেন্ট একটু মুশকিল হবে। আজ রাতটা ফাস্ট করুন। কাল থেকে আবার খাবেন, কেমন?

কানহাইয়া লোকটা আমাদের ব্যাগগুলো এবার ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

বেশি ঝামেলা করবেন না মিস্টার মিত্তির। রাধেশ্যাম হ্যাঁজ ইওর রিভলভার। উয়ো আলতু ফালতু আদমি নহী হ্যায়। গোলি চালাতে জানে। আর মনে রাখবেন কি হংকং ইজ নট ক্যালকাটা। প্রদোষ মিটার ইজ নোবডি হিয়ার। আমি চলি। কাল সকালে দশটার সময় এসে এরা আপনাদের ফ্রি করে দেবে। গুড নাইট।

ঘরের আলো ইতিমধ্যে অনেক কমে গেছে। বুঝতে পারছি সূর্য ডুবে গেছে। এ ঘরে বাল্‌বের হোলডার আছে, কিন্তু বাল্‌ব নেই।

হীরালাল চলে গেলেন। কানহাইয়া এগিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করার জন্য পাল্লাটা টানল।

কানহাইয়া! কানহাইয়া!

মনিবের ডাক শুনে কানহাইয়া হুজুর বলে ডাইনে বেরিয়ে গেল, রাধেশ্যাম এগিয়ে এল তার কাজটা শেষ করে দেবার জন্য, আর সেই মুহূর্তে ঘটে গেল এক তুলাকালাম কাণ্ড।

ফেলুদার সামনে ওর কাঁধের ব্যাগটা পড়ে ছিল, ও সেটাকে চোখের নিমেষে তুলে প্রচণ্ড বেগে ছুঁড়ল দরজার দিকে, আর সেই সঙ্গে এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাধেশ্যামের উপর।

ফেলুদার সঙ্গে থেকে আমারও একটা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এসে গেছে, আমিও লাফিয়ে এগিয়ে গেছি।

ইতিমধ্যে ফেলুদা জাপটে ধরেছে রাধেশ্যামকে, তার হাত থেকে রিভলভার ছিটকে পড়ে গেছে মেঝেতে। ফেলুদা ওটা তোল বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি রিভলভারটা হাতে নিয়ে নিয়েছি—আমার হাতের রিভলভার তার দিকে তাগ করা। ছেলেবেলা এয়ার গান চালিয়েছি, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে মিস করার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

রাধেশ্যাম লোকটা তাগড়াই, সে প্রাণপণে চেষ্টা করছে ফেলুদার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। এমন সময় হঠাৎ দেখি লালমোহনবাবু ঘর থেকে একটা মাঝারি গোছের প্যাকিং কেস তুলে এনে সেটা দুহাতে ধরে তিড়িৎ-তিড়িং এদিক-ওদিক লাফাচ্ছেন রাধেশ্যামের মাথায় সেটাকে মারার সুযোগের জন্য।

সুযোগ মিলল। প্যাকিং কেসের একটা কোনা রাধেশ্যামের ঘন কালো চুল ভেদ করে তার ব্রহ্মতালুতে এক মোক্ষম আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে দিল। এক ঝলক দেখলাম লোকটার চুল থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে মেঝের উপর।

ফেলুদা আমার হাত থেকে রিভলভার নিয়ে নিল। সেটা কানুহ।ইয়ার দিক থেকে এক চুলও নড়েনি।

ব্যাগগুলো বাইরে আন। আমার ছোট ব্যাগটা আমার কাঁধে ঝুলিয়ে দে। বড়টা তুই হাতে নে।

আমি আর লালমোহনবাবু মিলে আমাদের মাল বাইরে নিয়ে এলাম।

রাধেশ্যাম মেঝেতে পড়ে আছে; এবার ফেলুদার একটা আপার কাটে কানহাইয়াও তার পাশেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। যতক্ষণে এদের জ্ঞান হবে ততক্ষণে আমরা আউট অফ ডেনজার।

আমরা এতক্ষণ ছিলাম তিনতলায়। সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেখি চারিদিক জ্বলন্ত নিয়নে ছেয়ে আছে; চিনে ভাষায় দশ হাজার অক্ষরের সব অক্ষরই যেন আমাদের গিলে ফেলতে চাইছে চতুর্দিক থেকে। তবে এটা কোনও মেন রোড নয়। পিছন দিকের একটা মাঝারি রাস্তা। এখানে ট্রাম নেই, বাসও নেই; আছে ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ি আর মানুষ।

আমরা প্রথম দুটো ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে তৃতীয়টায় উঠলাম। উঠেই ফেলুদাকে প্রশ্নটা করলাম!

কানহাইয়াকে ডাকার ব্যাপারটা কি তোমার ক্যাসেটে বাজল?

ঠিক ধরেছিস। হীরালাল আসতেই রেকর্ডারটা আবার অন করে দিয়েছিলাম। কানহাইয়া বলে যখন দুবার ডাকল, তার পরেই বন্ধ করে দিয়েছিলাম। মন বলছিল ডাক দুটো কাজে লাগতে পারে। আর সত্যিই তাই হল।

আপনার জবাব নেই, বলল লালমোহনবাবু!

আপনারও, বলল ফেলুদা। আমি জানি ফেলুদা কথাটা অন্তর থেকে বলেছে।

পার্ল হোটেল পৌঁছাতে লাগল দশ মিনিট, ভাড়া উঠল সাড়ে সাত ডলার।

আমাদের ঘরে গিয়েই পূর্ণেন্দুবাবুকে একটা ফোন করল ফেলুদা। ভদ্রলোক জানালেন ফেলুদাকে নাকি অনেক চেষ্টা করেও পাননি। -হোটেলে বলল আপনারা নাকি আসেনইনি। আমি তো চিন্তায় পড়ে গোসলাম মশাই।

একবার আসতে পারবেন?

পারি বই কী। তা ছাড়া আপনাদের জন্য খবর আছে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে পূর্ণেন্দুবাবু চলে এলেন। ফেলুদা সংক্ষেপে আমাদের ঘটনাটা বলল।

এইসব শুনলে বাঙালির জন্য গর্বে বুকটা দশ হাত হয়ে ওঠে মশাই। যাকগে, এখন আমার খবরটা বলি। সেই ক্রিকোরিয়ান কোথায় থাকে সেটা তো টেলিফোনের বই দেখেই বেড়ি গেল। কিন্তু হীরালাল সামানির হদিসও পেয়েছি।

কী করে?

এখানে আরও পাঁচজন সোমানি থাকে। তাদের এক-এক করে ফোন করে বেরিয়ে গেল। হীরালাল হচ্ছে কেশব সোমানির খুড়তুতো ভাই। কেশবের কাপড়ের দোকান আছে কাউলুনে। কাউলুনেরই তার বাড়ি, আর হীরালাল সেখানেই উঠেছে। আপনার আর্মেনিয়ান তো সন্ধেবেলা আসছে। তাইওয়ানের প্লেন এসে গেছে। এতক্ষণে। হীরালাল নিশ্চয়ই আজই ছবি পাচার করবে। আমি ওয়াং শূ-কে পাঠিয়ে দিয়েছি সোমানির বাড়ির উপর চোখ রাখতে। আমাদের আপিসের এক ছোকরা। খুব স্মার্ট। তাকে বলা ছিল সোমানির বাড়ি থেকে কোনও গাড়ি বেরোতে দেখলেই যেন আমাকে ফোন করে।

ক্রিকোরিয়ান কোথায় থাকে?

ভিকটারিয়া হিল। হংকং-এ। অভিজাত পাড়া। সামানি রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা রওনা দিলে ওর আগেই ভিকটারিয়া হিল পৌঁছে যাব। তখন আপনি ইচ্ছে করলে ওকে মাঝপথে রুখতে পারেন। অবিশ্যি আপনার নিজের প্ল্যানটা কী সেটা আমার জানা ছিল না।

ফেলুদা পূর্ণেন্দুবাবুর পিঠ চাপড়ে দিল।

আপনি তো মশাই সাংঘাতিক বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। আপনার রাস্তা ছাড়া আর রাস্তাই নেই। কিন্তু সেই ছোকরার কাছ থেকে ফোন পেয়েছেন কি?

আমি এখানে আসার ঠিক আগেই করেছিল। অর্থাৎ মিনিট কুড়ি আগে। গাড়ি রওনা হয়ে গেছে। যিনি আসছেন তাঁর হাতে একটা ফ্ল্যাট কাগজের প্যাকেট।

তিন মিনিটের মধ্যে আমরা পূর্ণেন্দুবাবুর গাড়িতে করে রওনা দিয়ে দিলাম।

মিনিট দিশেকের মধ্যে গাড়ি প্যাঁচালো রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। যেন হিল-স্টেশনে যাচ্ছি। হংকং এখন আলোয় আলো, আর যত উপরে উঠছি ততই সমুদ্র পাহাড় রাস্তা গাড়ি হাইরাইজ সমেত সমস্ত শহরটা আরও বেশি বেশি করে দেখা যাচ্ছে, আর লালমোহনবাবু খালি বলছেন, স্বপ্ন রাজ্য, স্বপ্ন রাজ্য।

আরও কিছুক্ষণ যাবার পর পূর্ণেন্দুবাবু বললেন, এইবার বাড়ির নম্বরটা দেখে নিতে হবে।

গাছপালা বাগানে ঘেরা দারুণ সুন্দর সুন্দর সব পুরনো বাড়ি, দেখলেই মনে হয় সাহেবদের জন্য সাহেবদেরই তৈরি। তারই একটা বাড়ির গেটের সামনে এসে নম্বর দেখে বুঝলাম ক্রিকোরিয়ানের বাড়িতে এসে গেছি। আর এসেই দেখলাম ভিতরে পোর্টিকের এক পাশে একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে যেটা আমাদের চেনা। আমরা যখন সকালে পূর্ণেন্দুবাবুর গাড়ি থেকে নামছি, তখন এই গাড়িটাই আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

হীরালাল সোমানির গাড়ি।

আমাদের গাড়িটা আরেকটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারে একটা গাছের তলায় পার্ক করে পূর্ণেন্দুবাবু বললেন, সাহেবের বাড়িটার দিকে চোখ রাখার জন্য একটা গোপন জায়গা বার করতে হবে।

সেরকম একটা জায়গা পেয়েও গেলাম।

তবে বেশিক্ষণ আড়ি পাততে হল না।

মিনিটখানেকের মধ্যেই বাড়ির সামনের দরজাটা খুলে যাওয়াতে তার থেকে একটা চতুষ্কোণ আলো বেরিয়ে পড়ল বাগানের ঘাসের উপর, আর তার পরেই নেপথ্যে বলা গুড নাইটের সঙ্গে সঙ্গে হীরালাল নিজেই বেরিয়ে এসে তাঁর গাড়িতে উঠলেন, আর গাড়িও রওনা দিল বিলিতি এঞ্জিনের মৃদু গভীর শব্দ তুলল।

এবার কী করবেন? ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করলেন পূর্ণেন্দুবাবু।

সাহেবের সঙ্গে দেখা করব, বলল ফেলুদা।

আমরা আড়াল থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গিয়ে সাহেবের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম।

পোর্টিকোর দিকে এগোচ্ছি এমন সময় হঠাৎ এক অদ্ভুত ব্যাপার হল।

বাড়ির দরজা আবার খুলে গিয়ে উদভ্রান্ত ভাবে সাহেব স্বয়ং বেরিয়ে এসে আমাদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দৌড়ে এগিয়ে গেলেন গেটের দিকে। সাহেবের হাতে গিল্টিকরা নতুন ফ্রেমে বাঁধানো টিনটোরেটোর যীশু।

গেট থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে একবার চেয়ে মাথায় হাত দিয়ে সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন—স্কাউন্ড্রেল! সুইন্ডলার। সান-অফ-এ-বিচ!

তারপর আমাদের দিকে ফিরে দিশেহারা আধ-পাগলা ভাব করে বললেন, হি হ্যাঁজ জাস্ট সোল্ড মি এ ফেক—অ্যান্ড আই পেড ফিফটি থাউজ্যান্ড ডলারস ফর ইট।

অর্থাৎ লোকটা আমাকে এক্ষুনি একটা জাল ছবি বিক্রি করে গেল, আর আমি ওকে তার জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার দিলাম।

আমরা কে, কেন এসেছি তার বাড়িতে, এসব জানার কোনও প্রয়োজন বোধ করলেন না সাহেব।

তুমি কি টিনটারেটার ছবিটার কথা বলছ? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। সাহেব। আবার বোমার মতো ফেটে পড়লেন।

টিনটারেটা? টিনটারেটা মাই ফুট! এসো, তোমাকে দেখাচ্ছি, এসো!

সাহেব দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন পোর্টিকোর দিকে। আমরা চারজন তাঁর পিছনে।

পোর্টিকোর আলোতে সাহেব ছবিটা তুলে ধরলেন।

লুক অ্যাট দিস। থ্রি গ্রিন ফ্লাইজ স্টিকিং টু দ্য পেন্ট–থ্রি গ্রিন ফ্রাইজ! এই পোকা আমার জীবন অতিষ্ঠা করে তুলেছিল কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলে! সেই পোকা আটকে আছে এই ছবির ক্যানভাসে। আর লোকটা বলে কিনা ছবিটা জেনুইন!–হি ফুলড মি, বিকজ ইটস এ গুড কপি–বাট ইটস এ কপি।

ঠিক বলেছ বলল ফেলুদা, ষোড়শ শতাব্দীতে ইটালিতে এ পোকা থাকা সম্ভব না।

পোটিকের আলোতে দেখতে পাচ্ছি সাহেবের সাদা মুখ লাল হয়ে গেছে। –দ্যাট ডাটি ডাবল ক্রসিং সোয়াইন! লোকটার ঠিকানাটা পর্যন্ত জানি না।

ঠিকানা আমি জানি, বললেন পূর্ণেন্দুবাবু।

জান? সাহেব যেন ধড়ে প্রাণ পেলেন।

হ্যাঁ, জানি। কাউলুনে থাকেন। ভদ্রলোক। হানয় রোড।

গুড। দেখি ব্যাটা কী ভাবে পার পায়। আইল স্কিন হিম অ্যালাইভ।

তারপর সাহেব হঠাৎ ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, হু আর ইউ?

আমরা জানতাম ছবিটা জাল, তাই আপনাকে সাবধান করে দিতে আসছিলাম-– অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বলল ফেলুদা।

কিন্তু তাকে তো ধরা যেতে পারে, হঠাৎ বললেন পূর্ণেন্দুবাবু, এক্ষুনি চলুন না। আমার গাড়ি আছে। লোকটা এখনও বেশি দূর যায়নি।

সাহেবের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

লেট্স গো!

আসবার সময় চড়াই বলে বেশি স্পিড দেওয়া সম্ভব হয়নি; উতরাই পেয়ে পূর্ণেন্দুবাবু দেখিয়ে দিলেন তারাবাজি কাকে বলে। সোমানির পকেটে পঞ্চাশ হাজার ডলারের চেক, তার কাজ উদ্ধার হয়ে গেছে, তার আর তাড়া থাকবে কেন? পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা মোড় ঘুরেই দেখতে পেলাম চেনা গাড়িটাকে।

পূর্ণেন্দুবাবু, আরেকটু স্পিড বাড়িয়ে গাড়িটার একেবারে পিছনে এসে পড়লেন। তারপর বার কয়েক হর্ন দিতেই সোমানির গাড়ি পাশ দিল। পূর্ণেন্দুবাবু ওভারটেক করে নিজের গাড়িটাকে টেরচাভাবে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিলেন।

ব্যাপারটা দেখে সোমানি গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে, ক্রিকোরিয়ানও নেমেছেন ছবিটা হাতে নিয়ে, আর সেই সঙ্গে ফেলুদাও।

এক্সকিউজ মি!

ফেলুদা ক্রিকোরিয়ানের হাত থেকে ছবিটা নিয়ে নিল। ক্রিকোরিয়ান যেন বাধা দিতে গিয়েও পারল না।

তারপর বড় বড় পা ফেলে সোমানির দিকে এগিয়ে গিয়ে কী হচ্ছে সেটা বোঝার আগেই দেখলাম ছবি সমেত ফেলুদার হাত দুটো মাথার উপর উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে নেমে এল সোমানির মাথার উপর।

দিশি ক্যানভাস ফুঁড়ে সোমানির মাথাটা বেরিয়ে এল। বাইরে, আর ছবির গিল্টিকরা ফ্রেমটা হয়ে গেল। হতভম্ব ভদ্রলোকের গলার মালা।

এবার উনি আপনাকে আপনার চেকটা ফেরত দেবেন।

ফেলুদার হাতে এখন রিভলভার।

সোমানির হতভম্ব ভাবটা এখনও কাটেনি, কিন্তু ফেলুদার কথা বুঝতে ওঁর কোনও অসুবিধে হল না।

কাঁপা হাত পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে চেকটা ঝর করে ক্রিকোরিয়ানের দিকে এগিয়ে দিলেন।

সাহেব যখন চেকটা ছিনিয়ে নিয়ে পকেটে পুরছেন, তখন সোমানির হাঁ করা মুখ আরও হাঁ করিয়ে দিয়ে ফেলুদা বলল–

এই যে আপনার সর্বনাশটা হল, হীরালালজি, এর জন্য কিন্তু আমি দায়ী নই, দায়ী তিনটি সবুজ পোকা।

১২. হংকং-এ হিমসিম

সবচেয়ে যেটা অবাক লাগছিল সেটা হল দ্বিতীয় ছবিটাও জাল বেরিয়ে পড়া। কিন্তু আশ্চর্য এটা নিয়ে ফেলুদা কোনও মন্তব্যই করল না। এমনিতে ছবিটা দেখে একেবারেই জাল বলে। মনে হয়নি। লালমোহনবাবু তো বললেন, ইটালিতে চারশো বছর আগে শ্যামাপোকা ছিল ন-এ ব্যাপারে আপনি এত শিওর হচ্ছেন কী করে? হয়তো পশ্চিম থেকেই আমদানি হয়েছে। এই পোকার। শুনিচি তো কচুরিপানাও এদেশে এককালে ছিল না, সেটা নাকি এসেছে এক মেমসাহেবের সঙ্গে।

এতেও ফেলুদা তার একপেশে হাসিটা ছাড়া কোনও মন্তব্য করল না।

পরদিন পূর্ণেন্দুবাবু এয়ারপোর্টে এলেন আমাদের সি-অফ করতে। ফেলুদা তাঁকে একটা ভাল টাই কিনে উপহার দিল। ভদ্রলোক বললেন, চব্বিশ ঘণ্টায় একটা ছোটখাটো ঝড় বইয়ে দিলেন মশাই হংকং-এ। তবে এর পরের বার আরেকটু বেশি দিন থাকতে হবে। আপনাদের সাপের মাংস না খাইয়ে ছাড়ছি না।

হংকং ছাড়তে সত্যিই ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু আমি জানি ফেলুদা যে-কয়েকটা মন্ত্রে বিশ্বাস করে তার মধ্যে একটা হল ডিউটি ফাস্ট। এত রহস্যের সমাধান বাকি আছে–নকল খীশুর রহস্য, বঙ্কিমবাবু খুনের রহস্য, কুকুর খুনের রহস্য-সেগুলির একটা গতি না করে হংকং-ভোগ ফেলুদার ধাতে নেই।

বুধবার রাত্রে রওনা হয়ে বিষ্যুদবার দুপুর সাড়ে বারোটায় পৌঁছলাম। কলকাতা। এয়ারপোর্টেই লালমোহনবাবুকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে আজকের দিনটা বিশ্রাম। কাল সকাল আটটা নাগাত ট্যাক্সিতে ওঁর বাড়িতে পৌঁছে যাব, সেখান থেকে ওঁর গাড়িতে বৈকুণ্ঠপুর। ফেরার পথে ফেলুদা একবার পার্ক স্ট্রিট পোস্ট আপিসে থামল। বলল, একটা জরুরি টেলিগ্রাম করার আছে; কাকে সেটা বলল না।

বাকি দিনটা ফেলুদার পেট থেকে আর কোনও কথা বার করা গেল না। ওর এই মৌনী অবস্থাটা আমার খুব ভাল জানা আছে। এটা হচ্ছে ঝড়ের থমথমে পূর্বাবস্থা। আমি নিজে অনেক ভেবেও কুলকিনারা পাইনি। এখনও যেই তিমিরে সেই তিমিরে। তার উপর এক'দিনের হংকং-এর ধাক্কায় এমনিতেই সব তালগোল পাকিয়ে গেছে, চোখ বুজলেই এখনও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আকাশের গায়ে ঝুলছে লম্বা লম্বা চিনে অক্ষর।

পরদিন বৈকুণ্ঠপুর পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় এগারোটা হয়ে গেল।

নবকুমারবাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে হংকং-এর কথা জিজ্ঞেস করতে ফেলুদার মাথা নাড়তে হল।

ছবি পাওয়া যায়নি।

যেটা ছিল সেটাও জাল, বলল ফেলুদা।

সে কী করে হয় মশাই? দু-দুটো জাল? তা হলে আসলটা গেল কোথায়?

আমরা সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। ফেলুদা বলল, ওপরে চলুন। বৈঠকখানায় বসে কথা হবে।

বৈঠকখানায় গিয়ে দেখি মহাদেব মণ্ডল বসে লেবুর সরবত খাচ্ছেন।

কী মশাই–মিশন সাকসেসফুল? প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

চোরাই মাল পাওয়া যায়নি। তবে সেটা আমারই ভুল। অন্য দিক দিয়ে সাকসেসফুল বই কী।

বটে? খুনি?

সে হয়তো নিজেই ধরা দেবে।

বলেন কী!

ফেলুদা আর চেয়ারে বসল না। আমাদের জন্যও ট্রে-তে সরবত এসেছিল, একটা গেলাস তুলে নিয়ে তাতে একটা চুমুক দিয়ে টেবিলে নামিয়ে রেখে ফেলুদা পকেট থেকে খাতাটা বার করল। আমরা সবাই ওকে ঘিরে সোফায় বসেছি।

আমার মনে হয় শুরু থেকেই শুরু করা ভাল, বলল ফেলুদা। তারপর খাতাটা একটা বিশেষ পাতায় খুলে সেটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল–

২৮শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বৈকুণ্ঠপুরে দুটো ঘটনা ঘটে–নবকুমারবাবুদের ফক্স টেরিয়ার ঠুমরীকে কে জানি বিষ খাইয়ে মারে, আর চন্দ্রশেখরের ছেলে রুদ্রশেখর বৈকুণ্ঠপুরে আসেন। এটা একই দিনে ঘটায় আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল এই দুটোর মধ্যে কোনও যোগ আছে কি না। একটা পোষা কুকুরকে কে মারতে পারে এবং কেন মারতে পারে, এই প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে গিয়ে দুটো উত্তর পেলাম। কোনও বাড়ির কুকুর যদি ভাল পাহারাদার হয়, তা হলে সে বাড়ি থেকে কিছু চুরি করতে হলে চোর কুকুরকে আগে থেকে সরিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু এখানে চুরি যেটা হয়েছে সেটা কুকুর মারা যাবার অনেক পরে। তাই আমাকে দ্বিতীয় কারণটার কথা ভাবতে হল। সেটা হল, কোনও ব্যক্তি যদি তার পরিচয় গোপন করে ছদ্মবেশে কোনও বাড়িতে আসতে চায়, এবং সে ব্যক্তি যদি সে বাড়ির কুকুরের খুব চেনা হয়, তা হলে কুকুর ব্যাঘাতের সৃষ্টি করতে পারে। এবং সেই কারণে কুকুরকে সরানোর প্রয়োজন হতে পারে। কারণ, কুকুর প্রধানত মানুষ চেনে মানুষের গায়ের গন্ধ থেকে এবং এই গন্ধ ছদ্মবেশে ঢাকা পড়ে না।

তখনই মনে হল রুদ্রশেখর হয়তো আপনাদের চেনা লোক হতে পারে। তার হাবভাবেও এ বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হল। তিনি কথা প্রায় বলতেন না, ঘোলাটে চশমা ব্যবহার করতেন, পারতে কারুর সামনে বেরোতেন না। তা হলে এই রুদ্রশেখর আসলে কে? তিনি ইটালি থেকে এসেছেন, অথচ পয়ে ব্যাটার জুতো পরেন। তিনি তাঁর পাসপোর্ট আপনার বাবাকে দেখিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আপনার বাবা চোখে ভাল দেখেন না, এবং

চক্ষুলজ্জার খাতিরে পাসপোর্ট খুঁটিয়ে দেখবেন না, তাই জাল পাসপোর্ট চালানো খুব কঠিন নয়।

অথচ পাসপোর্ট যদি জাল হয়, তা হলে চন্দ্রশেখরের সম্পত্তি পাবার ব্যাপারেও তিনি ব্যর্থ হতে বাধ্য, কারণ উকিলের কাছে তিনি কোনওদিনও প্রমাণ করতে পারবেন না যে তিনি চন্দ্রশেখরের ছেলে।

তা হলে তিনি এলেন কেন? কারণ একটাই-চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিগত সংগ্রহের মহামূল্য ছবিটি হাত করার জন্য। ভূদেব সিং-এর প্রবন্ধের দৌলতে এ ছবির কথা আজ ভারতবর্ষের অনেকেরই জানা।

যিনি রুদ্রশেখরের ভেক ধরে এসেছিলেন, তিনি একটা কথা জানতেন না, যে কথাটা আমরা জেনেছি চন্দ্রশেখরের বাক্সে পাওয়া একটি ইটালিয়ান খবরের কাগজের কাটিং থেকে। এই খবরে বলা হয়েছে, আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগে রোম শহরে রুদ্রশেখরের মৃত্যু হয়।

অ্যাঁ!—নবকুমারবাবু প্রায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, নবকুমারবাবু। আর খবরটার জন্য আমি রবীনবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ।

তা হলে এখানে এসেছিল কে?

ফেলুদা এবার পকেট থেকে একটা কাগজ বার করল। একটা ম্যাগাজিনের পাতা।

হংকং-এ অত্যন্ত আকস্মিকভাবে এই পত্রিকার পাতাটা আমার চোখে পড়ে যায়। এই ভদ্রলোকের ছবিটা একবার দেখবেন কি নবকুমারবাবু? মোম্বাসা নামক একটি হিন্দি ফিল্মের ছবি এটা। ১৯৭৬-এর ছবি। এই ছবির অনেক অংশ আফ্রিকায় তোলা হয়েছিল। এতে ভিলেনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এই শ্মশ্রু-গুম্ফ বিশিষ্ট ভদ্রলোকটি। দেখুন তো একে চেনেন কি না।

কাগজটা হাতে নিয়ে নবকুমারবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল।

এই তো রুদ্রশেখর!

নীচে নামটা পড়ে দেখুন।

নবকুমারবাবু নীচের দিকে চাইলেন।

মাই গড! নন্দ!

হ্যাঁ, নবকুমারবাবু। ইনি আপনারই ভাই! প্রায় এই একই মেক-আপে তিনি এসেছিলেন। রুদ্রশেখর সেজে। আসল দাড়ি-গোঁফ, নকল নয়। কেবল চুলটা বোধহয় ছিল পরচুলা। আসবার আগে তাঁর কোনও চেনা লোককে দিয়ে রোম থেকে একটা চিঠি লিখিয়েছিল। সৌম্যশেখরকে। এ কাজটা করা অত্যন্ত সোজা।

নবকুমারবাবুর অবস্থা শোচনীয়। বার বার মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, নন্দটা চিরকালই রেকলেস।

ফেলুদা বলল, আসল ছবি হঠাৎ মিসিং হলে মুশকিল হত, তাই উনি কলকাতা থেকে আর্টিস্ট আনিয়ে তার একটা কপি করিয়ে নিয়েছিলেন। কোনও কারণে বোধহয় বঙ্কিমবাবুর সন্দেহ হয়, তাই যেদিন ভোরে নন্দকুমার যাবেন সেদিন সাড়ে তিনটায় অ্যালার্ম লাগিয়ে স্টুডিয়োতে গিয়েছিলেন। এবং তখনই তিনি নিহত হন।

বৈঠকখানায় কিছুক্ষণের জন্য পিন-ড্রপ সাইলেন্স। তারপর ফেলুদা বলল, অবিশ্যি একজন ব্যক্তি নন্দবাবুকে আগেই ধরিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু দেননি। কারণ তাঁর বোধহয় লজ্জা করছিল। তাই নয় কি?

প্রশ্নটা ফেলুদা করল। যাঁর দিকে চেয়ে তিনি মিনিটখানেক হল ঘরে এসে এক কোনায় একটা সোফায় বসেছেন।

সাংবাদিক রবীন চৌধুরী।

সত্যিই কি? আপনি সত্যিই পারতেন নন্দকে ধরিয়ে দিতে? নন্দকুমারব্বাবু প্রশ্ন করলেন।

রবীনবাবু একটু হেসে ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, এতদূর যখন বলেছেন, তখন বাকিটাও আপনিই বলুন না।

আমি বলতে পারি, কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর তো আমার জানা নেই রবীনবাবু। সেখানে আপনার আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে।

বেশ তো, করব। আপনার কী কী প্রশ্ন আছে বলুন।

এক—আপনি যে সেদিন বললেন ইটালিয়ান কাগজের খবরটা পড়তে আপনার ডিকশনারির সাহায্য নিতে হয়েছিল, সেটা বোধহয় মিথ্যে, না?

হাঁ, মিথ্যে।

আর আপনার শার্টের বাঁ দিকে যে লাল রংটা লেগে রয়েছে, যেটাকে প্রথম দেখে রক্ত বলে মনে হয়েছিল, সেটা আসলে অয়েল পেস্ট, তাই না?

তাই।

আপনি পেন্টিং শিখেছিলেন বোধহয়?

হ্যাঁ।

কোথায়?

সুইটজারল্যান্ডে। বাবা মারা যাবার পর মা আমাকে নিয়ে সুইটজারল্যান্ডে চলে যান। মা নার্সিং শিখেছিলেন, জুরিখে একটা হাসপাতালে যোগ দেন। আমার বয়স তখন তেরো। আমি লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্ট অ্যাকাডেমিতে ক্লাস করি।

কিন্তু বাংলাটা শিখলেন কোথায়?

সেটা আরও পরে। ১৯৬৬-তে আমি প্যারিসে যাই একটা আর্ট স্কুলের শিক্ষক হিসেবে। ওখানে কিছু বাঙালির সঙ্গে পরিচয় হয় এবং বাংলা শেখার ইচ্ছে হয়। শেষে সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার ক্লাসে যোগ দিই। ভাষার উপর আমার দখল ছিল, কাজেই শিখতে মুশকিল হয়নি। বছর দু-এক হল চন্দ্রশেখরের জীবনী লেখা স্থির করি। রোমে যাই। ভেনিসেও গিয়ে ক্যাসিনি পরিবারের সঙ্গে আলাপ করি। সেখানেই টিনটারেটার ছবিটার কথা জানতে পারি।

তার মানে আপনিও একটি কপি করেছিলেন টিনটোরেটো ছবির। এবং সেই কপিই হীরালাল সোমানি নিয়ে গিয়েছিল। হংকং- এ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হলে আসলটা কোথায়? চেঁচিয়ে উঠলেন নবকুমারবাবু।

ওটা আমার কাছেই আছে, বললেন রবীনবাবু।

কেন, আপনার কাছে কেন?

ওটা আমার কাছে আছে বলেই এখনও আছে, না-হলে হংকং চলে যেত। এখানে এসেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে ওটাকে সরাবার মতলব করছেন জাল-বিরুদ্রশেখর। তাই ওটার একটা কঁপি করে, আসলটাকে আমার কাছে রেখে কপিটকে ফ্রেমে ভরে টাঙিয়ে রেখেছিলাম।

ফেলুদা বলল, আসলটা তো আপনারই নেবার ইচ্ছে ছিল, তাই না?

নিজের জন্য নয়। আমি ভেবেছিলাম। ওটা ইউরোপের কোনও মিউজিয়ামে গিয়ে দেব। পৃথিবীর যে-কোনও মিউজিয়াম ওটা পেলে লুফে নেবে।

আপনি মিউজিয়ামে দেবেন। মানে? সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বললেন নবকুমারবাবু।ওটা তো নিয়োগী পরিবারের সম্পত্তি।

আপনি ঠিকই বলেছেন নবকুমারবাবু, বলল ফেলুদা, কিন্তু উনিও যে নিয়োগী পরিবারেরই একজন।

মানে?

আমার বিশ্বাস উনি রুদ্রশেখরের পুত্র ও চন্দ্রশেখরের নাতি–রাজশেখর নিয়োগী। অর্থাৎ আপনার আপনি খুড়তুতো ভাই। ওঁর পাসপোর্টও নিশ্চয়ই সেই কথাই বলছে।

নবকুমারবাবুর মতো আমরা সকলেই থ।

রবীন–থুড়ি, রাজশেখরবাবু বললেন, পাসপোর্টটা কোনওদিন দেখাতে হবে ভাবিনি। আমি ভেবেছিলাম ছদ্মনামে এখানে থেকে ঠাকুরদাদা সম্বন্ধে রিসার্চ করে চলে যাব, আর যেহেতু ছবিটা উত্তরাধিকারসূত্রে আমারই প্রাপ্য, ওটা নিয়ে যাব। কিন্তু ঘটনাচক্রে এবং প্রদোষবাবুর আশ্চর্য বুদ্ধির জন্য–আসল পরিচয়টা দিতেই হল। আশা করি আপনারা অপরাধ নেবেন না।

ফেলুদা বলল, এখানে একটা কথা বলি রাজশেখরবাবু–পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত চন্দ্রশেখরের চিঠি পেয়েছেন ভূদেব সিং। কাজেই আইনত ছবিটা এখনও আপনার প্রাপ্য নয়। কিন্তু আমার মতে ছবি আপনার কাছেই থাকা উচিত। কারণ আপনিই সত্যি করে এটার কদর করবেন। কী বলেন নবকুমারবাবু?

একশোবার। কিন্তু মিস্টার মিত্তির, আপনার সন্দেহটা হল কী করে বলুন তো? আমার কাছে তো সমস্ত ব্যাপারটা ভেলকির মতো।

ফেলুদা বলল, উনি যে বাংলাদেশের বাঙালি নন। সেটা সন্দেহ হয় সেদিন দুপুরে ওঁর খাওয়া দেখে। সুক্তো কখন খেতে হয় সেটা বাংলার বাঙালিরা ভাল ভাবেই জানে। ইনি দেখলাম বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে প্রথমে খেলেন ডাল, তারপর মাছ, সব শেষে সুক্তো। তা ছাড়া, সন্দেহের দ্বিতীয় কারণ হল–

এবার ফেলুদা যে ব্যাপারটা করল সেটা একেবারে ম্যাজিক।

উত্তরের দেওয়ালের দিকে গিয়ে চন্দ্রশেখরের আঁকা তাঁর বাবা অনন্তনাথের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দুটো হাত ছবির গোঁফে আর দাড়ির উপর চাপা দিতেই দেখা গেল মুখটা হয়ে গেছে রবীন চৌধুরীর!

লালমোহনবাবু ক্ল্যাপ দিয়ে উঠলেন, আর আমি অ্যাদ্দিনে বুঝতে পারলাম রবীনবাবুকে দেখে কেন চেনা চেনা মনে হত।

কিন্তু চমকের এখানেই শেষ না।

একটি চাকর কিছুক্ষণ হল একটা টেলিগ্রাম নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার সেটা নবকুমারবাবুর হাতে এল!

ভদ্রলোক সেটা খুলে পড়ে চোখ কপালে তুলে বললেন, আশ্চর্য! নন্দ লিখেছে আজ। সকালের ফ্লাইটে কলকাতায় আসছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ফেলুদা বলল, ওটার জন্য আমিই দায়ী, মিস্টার নিয়োগী। আপনার নাম করে কাল আমিই ওঁকে টেলিগ্রাম করেছিলাম।

আপনি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি বলেছিলাম সৌম্যশেখরবাবুর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। কন্ডিশন ক্রিটিক্যাল। কাম ইমিডিয়েটলি।

*

নবকুমারবাবুর কাছ থেকে আরও টাকা নেওয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ড আপত্তি করেছিল ফেলুদা। বলল, দেখলেন তো, তদন্তর ফলে বেরিয়ে গেল আপনার নিজের ভাই হচ্ছেন অপরাধী। তাতে নবকুমারবাবু বেশ বিরক্ত হয়েই বললেন, ওসব কথা আমি শুনতে চাই না। আপনি আমাদের হয়ে তদন্ত করেছেন। ফলাফলের জন্য তো আপনি দায়ী নন। আপনার প্রাপ্য আপনি না নিলে আমরা অসন্তুষ্ট হব। সেটা নিশ্চয়ই আপনি চান না।

নিজের ভাই অপরাধী প্রমাণ হলেও, সেই সঙ্গে যে খুড়তুতো ভাইটিকে পেলেন নবকুমারবাবু, তেমন ভাই সহজে মেলে না। টিনটারেটার যীশু যে এখন উপযুক্ত লোকের হাতেই গেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিছুদিনের মধ্যেই সেটা ইউরোপের কোনও বিখ্যাত মিউজিয়ামের দেয়ালে শোভা পাবে।

আমরা আর এক' দিন ছিলাম বৈকুণ্ঠপুরে। ফেরার পথে লালমোহনবাবুর অনুরোধে একবার ভবেশ ভট্টাচার্যের ওখানে ঢুঁ মারতে হল। সামনের বছর বৈশাখের জন্য জটায়ু যে উপন্যাসটা লিখবেন সেটার নাম হংকং-এ হিমসিম হলে সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে ঠিক হবে কিনা সেটা জানা দরকার।